৩৬ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		২
বৃহদারণ্যক উপনিষদ (সংগ্রাহক)	আশীষ লাহিড়ী	৩
হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত (সং)	ঐ	৪
অসংগঠিত মানুষের লড়াই	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৫
জলবায়ু সঙ্কট	সমর বাগচী	৮
রোগ নিরাময়ে অ্যাসপিরিন	গৌতম মিস্ত্রি	১৩
বিপ্লবী নিবেদিতা	তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
স্মার্ট ক্লাস	সুদেষ্ণা গোষ	২৩
জলাভূমি	সুবীর ঘোষ	২৫
সুস্থায়ী কৃষির এক খোঁজ	সম্পদরঞ্জন পাত্র	২৮
বল ও শপিং মল	বিবর্তন ভট্টাচার্য	৩০
পুস্তক পর্যালোচনা		৩১

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রজিস্টার্ড অফিস ঃ বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪
কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস - ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা - ৭০০১৩৬
ফোন ঃ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৮৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট ঃ www.utsamanush.com
ই-মেল ঃ utsamanush1980@gmail.com

কালবুর্গি-দাদরি কথা

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

উনি যখন মৌন,
বুঝতে হবে বিষয়গুলি একেবারেই গৌণ।
কালবুর্গি পানসারে আর কে এক দাভোলকর-
ওরা ছিল নাস্তিক আর শয়তানেরই চর।
করত না দেবদেবী প্রণাম, বলত, 'প্রমাণ করো।
বিশ্বাসই বা করব কেন? যুক্তি তুলে ধরো।'
এ দেশে চাই শুদ্ধ মানুষ, বিশ্বাসে ভরপূর।
বিশ্বাসেই তো আসেন তিনি, তর্কে বহুদূর।
ভক্তের বিশ্বাসকে যারা বলে কুসংস্কার,
সে সব পাপীর এ ভারতে থাকার কী দরকার?
পাপীহত্যা করে যাঁরা হলেন পুণ্যবান্।
তাঁরাই হলেন খাঁটি ভক্ত, দেশের সুসন্তান।
স্বয়ং তুলে নিলেন কাঁধে ধর্মরক্ষাভার।
সবাই এঁদের সসম্মানে জানাই নমস্কার।

দাদরিতে এক বিধর্মী লোক গোরুহত্যা ক'রে
তারই মাংস খাবে বলে ফিরছিল তার ঘরে।
আদ্যিকালের মুনিঋষি, ধর্মগ্রন্থে বলে,
গোবৎসের মাংস খেতেন, রান্না ভাল হ'লে।
কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁদের কথা ভিন্ন।
দেশে এখন রাখব কেন মাতৃঘাতীর চিহ্ন?
গোরু মোদের মাতা আর বলদ মোদের বাপ।
সবাই জানে গোহত্যা মহা মহাপাপ।
সে কথা এক মহাভক্ত করে দেন প্রচার।
উত্তেজনায় করল ক'জন পাপীকে সংহার।
এই পবিত্র কাজের জন্য নিন্দা হচ্ছে দেশে।
এমন করলে ধর্ম যাবে বানের জলে ভেসে।

বলছিল কেউ, ও ফিরছিল অন্যমাংস কিনে।
গোমাংস কি খায়নি লোকটা অন্য কো দিনে?
সোজা কথা, এই দেশেতে যেমন আছ থাকো।
একটি শর্ত, ভুলেও গোরুর মাংস খেও নাকো।
যা খুশি তাই খাচ্ছে দেখি, কে কার কথা শোনে?
বুঝছে নাকি, কতো লোকের আঘাত লাগছে মনে?
দূর হোক উৎপাত,
ভক্তিভরে নিয়ম করে শোনো 'মন কী বাত'।

আমাদের কথা

এবারের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় দারুণ ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে এত শ্রোতা এসেছিলেন যে অনেককে বসতে জায়গা দেওয়াও যায় নি। তবু তাঁরা ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়েই শুনেছেন। তাঁদের বসার জায়গা দিতে না পারার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। শ্যামল ভদ্রের মুখবন্ধের পর এবার পাওয়া গিয়েছিল প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে। উৎস মানুষ পত্রিকার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে গানটি তিনি বেঁধেছিলেন সেই 'প্রশ্ন কখনও হয় না শেষ' গেয়ে তিনি সূচনা করেন অনুষ্ঠানের। প্রায় দু দশক আগে উৎস মানুষ প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ অন্য চোখে'র প্রকাশ অনুষ্ঠানের পর অশোকের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ-গবেষক রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়। রাজাগোপাল-সংরক্ষিত সেই সাক্ষাৎকারটি অশোকের বন্ধু দিলীপ সোম সম্পাদনা করেন। সেটিকে সিডিবন্দী করে দেন পত্রিকার বিশেষ বন্ধু সৌম্যেন পাল। এদিন সেটি অশোকের দাদা দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন নিরঞ্জন হালদার। রাজাগোপাল জানান, সাক্ষাৎকারের নেপথ্য কাহিনী। বলেন সমর বাগচীও। এরপরে ছিল গান। দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনান বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রাজশ্রী ভট্টাচার্য। তারপরে ছিল স্মারক বক্তৃতা। বিষয়— 'বাঙালি মননে বিজ্ঞান চেতনা'। শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরে জমে ওঠে বক্তৃতা।

প্রতি বছরই মহাধুমধামের সঙ্গে সায়েন্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বেদের সময়ে মুনিঋষিরা বিমানে যাতায়াত করতেন। তাই রাইট ভাইয়েরা নন, বিমান আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভারতেরই। এমন অসাধারণ সব বিষয় উঠে আসে সেখানে। গোটা দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যায় প্রাচীনত্বের গৌরবে। বুঝতে পারি, সত্যিই 'মেরা ভারত মহান'। দেশের কিছু বিজ্ঞানী ক্ষীণ স্বরে ও সুরে প্রতিবাদ করেন। তা কোনো দাগ কাটে না। এবার বোমাটি ফাটিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী বেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণন। সরাসরি বলেছেন, 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস একটি সার্কাস।' নোবেলজয়ীর প্রতিবাদে বুকে বল পেয়েছেন অন্য বিজ্ঞান-কর্তারা। হায়দরাবাদের বি এম বিড়লা সয়েন্স সেন্টারের অধিকর্তা বি জে সিদ্ধার্থের তোপ— 'বিজ্ঞান কংগ্রেস আসলে কুম্ভমেলা। যার প্রচারের আলোর সবটাই গিয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এসব না করে একটা মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুললে ভাল হয়।' সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিউকুলার বায়োলজির প্রতিষ্ঠাতা—অধিকর্তা পি এম ভার্গব, যিনি আগে দেশ জুড়ে অসহিষ্ণুতা নিয়ে পদ্মভূষণ সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মনে করেন, গত এক দশকে আইএসসি—র মান ক্রমশ নামছে। এসব করে অর্থের অপব্যয় ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। তবে নামী নিউক্লিয়ার গবেষক অনিল কাকোদকার, গণিতজ্ঞ মঞ্জুল ভার্গব, আশুতোষ শর্মার মতো অনেকেই এই জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজনের উপকারিতা নিয়ে সওয়াল করেছেন। বোঝাই যায়, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করে সরকারি মধু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় এঁদের রয়ে গিয়েছে। অতএব এটা নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেওয়া যায়, রামকৃষ্ণনের মতো কয়েকজন লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রতি বছর 'সার্কাস' অনুষ্ঠিত হয়েই চলবে। দেশটার নাম যে ভারত!

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরে জানা গিয়েছে, এক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী কালীঘাটের কালীর হাতে মাত্র ৪৯ লাখ ৪০০ টাকার একটি স্বর্ণখড়্গ দান করেছেন। ওজন মাত্র ২ কিলো ২৫৯ গ্রাম। স্থবির মায়ের হাতে অত ভা রী খাঁড়া চাপিয়ে দেওয়াটা ভক্তের যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। সারাক্ষণ ওইভাবে এত ভারী খাঁড়া ধরে থাকতে থাকতে মায়ের কাঁধে স্টিফ নেক এবং কনুইয়ে টেনিস এলবো হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। ভক্তেরা বলেন, মায়ের খাঁড়া দুষ্টের নাশ করেন। এটা সবার জানা, সোনা অতি-নমনীয় ধাতু। তাই দিয়ে আর যাই কাটা যাক মানুষ বা পাঁঠার গর্দান কাটা যায় না। অগত্যা দুষ্টদের পোয়াবারো। যে অতিভক্ত, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক 'সুসন্তান' খাঁড়াটি দিয়েছেন, তিনি দোষ করলে তো কথাই নেই। মা-ছেলের দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে যে আয়কর, এনফোর্সমেন্ট দপ্তর ঢুকবে না, তা বলাই বাহুল্য।

বিনা মন্তব্যে

Brihad-aranyaka Upanishad
Chapter VI
Fourth Brahamana
Procreation Ceremonie

14. If one wishes that his son should study the Veda, that he should attain a full term of life, they should have rice cooked with milk and eat it with clarified butter, then they should be able to beget (him).

15. Now, if one wishes that his son should be born of a tawny or brown complexion, that he should study the two Vedas, that he should attain a full term of life, they should have rice cooked in curds and eat it with clarified butter, then they should be able to beget (him).

16. Now, if one wishes that his son should be born of a dark complexion with red eyes, that he should study the three Vedas, that he should attain a full term of life, then they should have rice cooked in water and eat it with clarified butter, then they should be able to beget (him).

17. Now if one wishes that his daughter dhould be born, who is learned, that she should attain a full term of life, they should have rice cooked with sesamum and eat it with clarified butter, then they should be able to beget (her).

18. Now if one widhes that a son, learned, famous, a frequenter of assemblies, a speaker of delightful words, that he should study all the Vedas, that he should attain a full term of life, they should have rice cooked with meat and eat it with clarified butter, then they should be able to beget (such a son)– either veal or beef.

(S. Radhakrshnan, The Principal Upanisads, Indus, New Delhi, 1994, pp. 325-326.)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ
ষষ্ঠ অধ্যায়
চতুর্থ ব্রাহ্মণ
প্রজনন ঘটিত আচার-অনুষ্ঠান

যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক ফর্সা, সে যেন বেদ পাঠে পারঙ্গম হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত, দুধে-রাঁধা অন্ন ঘৃতের সঙ্গে মিশিয়ে আহার করা, এটা করলে তারা (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

আবার, যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক কপিল পিঙ্গল, সে হবে দুটি বেদ পাঠে পারঙ্গম, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত দধি-পক্ক অন্ন ঘৃতের সঙ্গে মিশিয়ে আহার করা, এটা করলে তারা (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

আবার, যদি কেউ কামনা করে যে তার পুত্রের গায়ের রঙ হোক কালো, চোখ দুটি হোক রক্তবর্ণ, সে যেন তিনটি বেদ পাঠে পারঙ্গম হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত জলে-রাঁধা অন্ন ঘৃতের সঙ্গে মিশিয়ে আহার করা, এটা করলে তারা (সেই পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

আবার, যদি কেউ কামনা করে যে তার একটি কন্যা হোক, সে যেন সুশিক্ষিতা হয়, সে যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে, তাহলে তাদের উচিত তিলের সঙ্গে ভাত রেঁধে ঘৃতের সঙ্গে আহার করা, এটা করলে তারা (সেই কন্যা) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

আবার, যদি কেউ এমন এক পুত্র কামনা করে যে হবে পণ্ডিত, বিখ্যাত, বহু সমাবেশে যাতায়াতকারী, যে হবে মধুরভাষী, যে সবকটি বেদ পাঠে পারঙ্গম হবে, যে পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকবে, তাহলে তাদের উচিত মাংসের সঙ্গে রাঁধা অন্ন ঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করা, এটা করলে তারা (সেই রকম পুত্র) উৎপাদন করতে সক্ষম হবে – হয় বাছুরের মাংস, নাহয় গোমাংস।

সাংগ্রহক ও অনুবাদকদ্বয় আশীষ লাহিড়ী

মনুসংহিতার যুগে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

হিন্দুধর্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্য-পান ও গো-মাংসাদি নানাবিধ মাংসভোজন সচরাচর প্রচলিত ছিল।—

> মাংস-ভোজন, মদ্য-পান ও স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে দোষ নাই। এই সকল বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তিই আছে, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহাফল জন্মে (মনুসংহিতা ৫।৫৬)
>
> মধুপর্কে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে, পিতৃ-কৃত্যে ও দৈবকর্মে পশু বধ করা বিধেয় কিন্তু অন্য স্থলে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন। (মনুসংহিতা ৫।৪১)

পূর্ব্বে মধুপর্কে অতিথিকে গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গোঘ্ন অর্থাৎ গোহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।—

> ‘‘সমাংসমধুপর্ক’’ এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লোকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগল প্রদান করে; ধর্মসূত্ররচয়িতা পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দেন (উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক।)

ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গো-খাদক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে পাদ্রি উইলসন ও শেখ অলিউল্লার সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না।

তদ্ভিন্ন সে সময়ে ছাগ, নানাপ্রকার মৃগ, শশারু, কূর্ম্ম, গন্ডার, মেষ, বহুপ্রকার পক্ষী, শূকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ-ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার বিশেষরবপ ব্যবস্থা আছে।

(উৎসঞ্চ **ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়**, দ্বিতীয় খণ্ড, উপক্রমণিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩); বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত করুণা প্রকাশনী সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)।

সাংগ্রহকঞ্চ আশীষ লাহিড়ী

কর্ণাটকে টেলিভিশনে জ্যোতিষ নিষিদ্ধ হবে?

বাস্তবায়িত হোক বা না হোক, কর্ণাটক সরকারকে, বিশেষত সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে এই জন্যই ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তাঁরা টেলিভিশনে জ্যোতিষ নিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করার কথা ভাবছেন। জানা গিয়েছে, কুসংস্কার প্রচারের বাড়াবাড়ি রুখতে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘কর্নাটক-এ প্রায় সব টেলিভিশন চ্যানেল জ্যোতিষ নিয়ে অনুষ্ঠান করতে চায়। আমার বাড়িতেও এই অনুষ্ঠান নিয়ে উৎসাহের অভাব নেই। এখনি এসব বন্ধ করা খুব জরুরি।’ উল্লেখ্য, আগেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার পরিকল্পনা করে নানান গোষ্ঠীর চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। অনেকেই মনে করেন, কর্ণাটকে জ্যোতিষে বিশ্বাস করে এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই জ্যোতিষ নিয়ে অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা অত সহজ হবে না। যেসব বড় বড় চ্যানেল জ্যোতিষ নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় সেসব চ্যানেলের টি আর পি বেশি। এত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে কর্ণাটক টিভিতে জ্যোতিষ প্রচার বন্ধ করতে পারলে গোটা দেশের কাছেই তা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

বইমেলায় উৎস মানুষ স্টল নং ৩৬৫

প্রতিবারই বইমেলায় উৎস মানুষ হাজির থাকে। পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। চলে ভাব-বিনিময়। পাওয়া যায় মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ। যা সারা বছরের চালিকাশক্তি জোগায়। তাই প্রতিবারের মতো দেখা হবে স্টলে। নং ৩৬৫-তে। ।

জীবন-জীবিকা নিয়ে আন্দোলনে রাজনীতির রঙ লাগতে পারে না

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

গতবারের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার এটি পঞ্চম তথা শেষ অংশ। এবারের স্মারক বক্তৃতার বক্তা ছিলেন লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁর লেখার নির্যাস আগামী সংখ্যায়।

সম্পাদক

বিপলুনঙ্ক একরকম খাঁড়ি দিয়েই ঘেরা মহারাষ্ট্রের রত্নগিরির বিপলুন ব্লকের চুয়াল্লিশটি গ্রাম। বিপলুনের পাশের ব্লকটির নাম খের। ৯০-এর গোড়ায় সেখানে ২৪০টি শিল্প নিয়ে একটি শিল্পতালুক তৈরি হয়েছিল। এই তালুকটির কোনও পরিশোধন ব্যবস্থা তৈরিই করা হয় নি। ফলে ২৪০টি শিল্পের বর্জ্য খাঁড়িতে পড়ে খাঁড়ির জল দূষিত হয়ে যায়। ২০ বছরের মধ্যে শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে ৪৮-এ নেমে আসে। কিন্তু খাঁড়ির জল-দূষণের কারণে সমুদ্র থেকে খাঁড়ির ভিতরে মাছ আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলে মানুষের প্রধান জীবিকা মৎস্য-ব্যবসা। প্রধান বলাটাও ঠিক না। বস্তুত একমাত্র জীবিকা।

এই ৪৪টি গ্রামের এক অদ্ভুত সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছি। খাঁড়ি দূষণের আগে গ্রামবাসীরা কখনও জীবিকার জন্য এই ৪৪টি গ্রামের বাইরে যান নি। এমনকি, এই গ্রামগুলির মধ্যেই গ্রামবাসীদের বিবাহ থেকে যাবতীয় সামাজিক আদান-প্রদান হত। এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা, মহারাষ্ট্রের সম্পন্ন গ্রামগুলির মতো নয়। কিন্তু খাওয়া-পরার অভাব নেই। নিজস্ব বাসস্থানও প্রত্যেক পরিবারের আছে। গ্রামে স্কুল আছে। সেখানেই ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শুরু করে। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে গেছেন। কিন্তু স্কুলের পড়া সকলের গ্রামেই হয়েছে।

'খের'-এর শিল্পতালুকের জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ক্ষতিপূরণ শেষ পর্যন্ত আর পাওয়া যায় নি। পুনর্বাসনের কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না। অস্থায়ী ভিত্তিতে কয়েকজন (সংখ্যাটা ১০ ছাড়ায় নি) কাজ পেয়েছিলেন। কিন্তু কারখানাগুলি যখন উঠে গেল, তখন অস্থায়ী কাজ স্থায়ী কাজে পরিণত হয় নি। ৪৪টি গ্রামের ৬০০ পরিবার তাদের জীবিকা হারিয়েছে। বর্জ্য ফেলে, খাঁড়িটিকে নর্দমায় পরিণত করেছে শিল্পতালুক। খাঁড়ি দূষিত হওয়ায় মাছ আসে না। এ'ছাড়া, 'এনরন'-এর 'পাওয়ার প্রজেক্ট'-এর জেটি তৈরি হয়েছে ঠিক সমুদ্র আর খাঁড়ির মোহনায়। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ খাঁড়িতে ডিম পাড়তে আসত। জেটিটি খাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় এবং বড় বড় জাহাজ সেই জেটিতে এসে দাঁড়ানোর ফলে মাছের ঢোকা বন্ধ। যেটুকু মাছ এদিক-ওদিক থেকে ঢুকতে পারত তারাও বিষাক্ত খাঁড়ির জলে মরে যেত।

এই শিল্পায়নের পদ্ধতির সঙ্গে এখানকার মৎস্যজীবীরা কোনওভাবেই যুক্ত নন। এর কোনও সুফলও তাঁরা পান নি, কিন্তু তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁরা গ্রামীণ পরিমণ্ডল ছেড়ে কাজের খোঁজে শহরে গেছেন। কাজ মেলে নি। কেউ কেউ যদি বা কাজ পেয়েছেন, তাতে নিজের পেট চালিয়ে বাড়িতে খুব সামান্য টাকাই তাঁরা পাঠাতে পারেন। ফলে জীবনযাত্রার মান আগের মতো রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে গেছে।

এবার আসি আন্দোলনের কথায়। ১৯৯৩ সালে 'মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' ৬৯০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে। মোট পাঁচটি গ্রামের জমি অধিগ্রহণের আওতায় পড়ে। এই জমির মধ্যে বসত জমি, চাষের জমি, অনাবাদী জমি— সবই ছিল।

মূলত চারটি দাবি নিয়ে গ্রামের মানুষ সংগঠিত হন এবং আন্দোলনে নামেন। ১নং দাবি— কেমিক্যাল শিল্প আনা চলবে না। কারণ অঞ্চলটি 'অতি সংবেদনশীল' হিসেবে স্বীকৃত এবং কেমিক্যাল শিল্প পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিবেশকে দূষিত করে। ২নং দাবি— বসতবাটী হারাবেন যাঁরা, তাঁদের বসতবাটীর জন্য জমি দিতে হবে। ৩নং দাবি— শিল্প করতে গিয়ে যে সব গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের রাস্তা, স্বাস্থ্য, স্কুল, পানীয় জল এইসব বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনের কাজটি সরকারের পক্ষ থেকেই করতে হবে। ৪নং দাবি— কৃষি ও হর্টিকালচারের জন্য সরকারকে পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এগোতে হবে।

প্রাথমিকভাবে সরকার এই চারটি দাবি মেনে নিলেও তারপর দাম ঠিক করা নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা দেয়।

এ ছাড়াও যা নিয়ে আন্দোলন নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে, তা হল, 'মহারাষ্ট্র ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' পুরো জমিটাই 'এস ই জেড'-এর জন্য ধার্য করেছে। যার মধ্যে ১৪১ হেক্টর জমি ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের জন্য ধার্য করেছে। এইখানে গ্রামবাসীদের আপত্তি। এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। যাঁরা জমি দিয়েছেন, তাঁরা কেউ এস ই জেড জেনে জমি দেন নি। এবং ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই পড়ে। ফলত সেটাও সরকারের চুক্তিভঙ্গ।

প্রথমে 'লোটে' শিল্পাঞ্চল প্রসারণের জন্য জমি চেয়েছিল। ওঁরা আদালতে যান। হাইকোর্ট বলে যে, জমির আয়তন অনুসারে ৩৩ শতাংশ কেমিক্যাল, ৩৩ শতাংশ ইলেকট্রনিক্স এবং বাকি ৩৩ শতাংশ সবুজ রাখতে হবে। হাইকোর্টের এই রায়ের পর আন্দোলনকারীরা থেমে যান কারণ 'লোটে'র শিল্পাঞ্চলে মোট জমির ৩৩ শতাংশে কেমিক্যাল শিল্প আগে থেকেই ছিল। ফলে, কেমিক্যাল শিল্প আর বাড়াবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু সরকারের পক্ষ থেকে মাটি পরীক্ষা করতে এলে, গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের সামনে পড়ে, ১৫ দিন অপেক্ষা করে চলে যায়।

এই আন্দোলনের কঠিন দিকটি হল, জমির মালিকদের সকলেরই ঠিকানা শহরে। তাঁদের জমির ওপর টান কম আর তাঁরা জমির ওপর নির্ভরশীলও নন। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে জমি কিনে নেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা এস ই জেড রুখে দেবার প্রশ্নে এক কাট্টা। সরকারকেও পিছু হঠতে বাধ্য করেছে।

জনগণের এই প্রতিরোধ আন্দোলন যে কেবল পরিবেশ রক্ষাতেই সীমিত, এমন নয়। গোটা ভারত জুড়েই আজ জীবন ও জীবিকা বাঁচাতে নানা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। পরিবেশ যদি ধ্বংস হয়, তাহলে জীবন জীবিকা কিছুই যে বাঁচানো যাবে না, এ কথা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ বুঝেছেন। যেমন বুঝেছেন যে, জমি নেওয়ার ব্যাপারে সরকার এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি যতটা তৎপর, নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ততটা নয়। জমি অধিগ্রহণের পর, বছরের পর বছর ফেলে রাখার দৃষ্টান্তও কম নয়। কারণ সরকার বা বহুজাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট শহরে জমি ব্যবহারের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না। ফলে, জমি পড়ে থাকে এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। গোটা ভারত জুড়ে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ভারতের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে এইরকম প্রতিরোধ আন্দোলনের কাহিনী। কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এইসব আন্দোলন দানা বাঁধে নি। সর্বত্র শুনেছি, 'আমরা নিজেরাই লড়ছি। কোনো দলের টাকা নিই নি।' কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে কোনও আঞ্চলিক নেতা এগিয়ে এসে, আবার পিছিয়ে গেছেন। যথার্থ অর্থে আন্দোলনের রাশ থেকেছে জনগণের হাতে। মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের 'ওড়াও' গ্রামে দেখেছি, রিলায়েন্স-এর অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সি পি এম এবং বি জে পি পার্টি সদস্য একসঙ্গে লড়ছেন। প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি, 'এটা আমাদের গ্রামের ব্যাপার।' কলিঙ্গনগরের 'বিস্থাপন বিরোধী মঞ্চ' বা মহারাষ্ট্রের 'সংঘর্ষ মোর্চা' সকলের একটাই উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা। তাঁদের সসম্মান বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি আদায়।

শেষ পর্যন্ত এইসব আন্দোলন কীভাবে, কোন্ পথে যায় সে বিষয়ে এখনও মন্তব্য করার সময় আসে নি। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সংসদীয় রাজনৈতিক দলের উপর নিজেদের জীবন-জীবিকার দায়িত্ব দিয়ে সাধারণ মানুষ আর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাই দলীয় রাজনীতির বাইরে নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন।

(সমাপ্ত)

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৫

স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী

গান শোনাচ্ছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়

বক্তব্য পেশ করছেন সমর বাগচী

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন রাজশ্রী ভট্টাচার্য

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারের সিডি দাদা দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন নিরঞ্জন হালদার

শ্রোতারা

ধনীদের জীবনশৈলিই বর্তমানে জলবায়ু সঙ্কটের প্রধান কারণ

সমর বাগচী

১৯৯২ সালে রিওডি জেনারিওতে বসুন্ধরা সম্মেলন হয় যেখানে প্রায় সমস্ত দেশের প্রধানরা উপস্থিত হন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (সিনিয়র) আসছিলেন না। আমেরিকার প্রতিনিধিদলের প্রধান যখন বুশকে জানান যে, উনি না এলে আমেরিকা একঘরে হয়ে পড়বে, তখন বুশ এলেন। কিন্তু আসার আগে তিনি আমেরিকার জনসাধারণকে জানান যে, 'আমরা আমেরিকার জীবনশৈলিকে পাল্টাব না।' বুশের আশ্বাস থেকেই বোঝা যায়, ধনী মানুষ তাদের জীবনশৈলি পাল্টাতে নারাজ। আর সেটাই আজকের জলবায়ু সঙ্কটের প্রধান কারণ। রিও কনফারেন্সে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)-এ স্থির হয়– বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে কনফারেন্স অভ পার্টিজ (কপ) গড়া হবে, যারা সিদ্ধান্ত নেবে, জলবায়ু পরিবর্তনকে রুখতে গেলে কী কী করতে হবে। কপ-এর ২১তম সম্মেলন হয়ে গেল প্যারিস শহরে, গত ডিসেম্বরে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ জানাল, তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) কমানোর বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা। ভারত সরকার UNFCC-কে ১ অক্টোবর জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের 'Intended Nationaly Determined Contribution (INDC)'। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে তার প্রস্তাব। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভারতের INDC নিয়ে আলোচনা।

UNFCC-কে ভারত যে INDC পাঠিয়েছে তা বিভিন্ন মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং নীতিনির্ণয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এই নীতিগুলিই ভারতের উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কী করে কমানো যায় বা তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। এই ৩৮ পাতার নথিতে দেখানো হয়েছে নগরায়ন/স্মার্ট সিটি (পৃঃ ১৩), যানবাহন (পৃঃ১৪), কৃষি (পৃঃ ২০), জল (পৃঃ ২১), জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা (পৃঃ ২২) এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল (পৃঃ ২৩) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান নীতি কী এবং ভবিষ্যতে কী কী নীতি নেওয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে গেলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাথমিক হিসেবে ভারতের প্রয়োজন ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার (২৫০০০০ কোটি টাকা)। INDC চাইছে কম খরচের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ। কিন্তু, এই বিরাট পরিমাণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে বিরাট সন্দেহ আছে।

কয়েকটি ব্যাপারে INDC-র প্রস্তাব প্রশংসার যোগ্য। যেমন, ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত ফটো ভোল্টাইক ব্যবস্থা (পৃঃ ৭)। শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি জায়গায়। খুব বেশি শক্তি ব্যবহার করে এমন আটটি ক্ষেত্রে ৪৭৮টি শিল্প কারখানাকে তাদের শক্তি দক্ষতা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে। বাড়িতে আলোর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে (পৃঃ ১১)। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে বেশ কিছু শহরে ১০০০ কিলোমিটারের বেশি Rapid man transport systems (RMRTS) চালু করা হবে। কিন্তু এই INDC ভারতের অনেক গভীর সমস্যাকে ছোঁয় নি।

ভারতে দরিদ্র মানুষ ও INDC

ভারতের INDC-তে দুটি প্রধান ঘোষণা আছে ঃ এক, 'To reduce the emiscions intensity of its GDP (Gross Domestic Product) by 33 to 35% by 2030 from 2005 levels'। এবং প্রায় '40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030' (পৃ২৯)। 'Emission intensity' বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রতি একক GDP-তে কত CO_2

এবং অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়া হবে। কম intensity-এর অর্থ হচ্ছে কম CO_2 বৃদ্ধি। কিন্তু INDC খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে ভারতে CO_2 নিঃসরণ বিরাটভাবে বেড়ে যাবে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক মন্দার কথা ভেবেও ধরা যেতে পারে যে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি বছরে কম করে ৫% হবে। এর অর্থ কী? ভারতের 'Emissions intensity' কম হলেও ভারতের মোট নিঃসরণ ২০৩০ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় হবে ২.৫ গুণ। ভারতের পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রকের অধীনে Indian Network on climate change Assessment-এর মতানুসারে ২০০৭ সালে ভারতের মোট CO_2 equivalent নিঃস্বরণ ছিল ১৯০.৪ কোটি টন। CO_2 equivalent বলতে বুঝি CO_2-এর সঙ্গে অন্যান্য, যেমন মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদির নিঃস্বরণ, যা বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ঘটায়। তাই ২০৩০ সালে ভারতের নিঃসরণ ঘটবে ৫০০ কোটি টন বা তারও বেশি CO_2। এই নিঃস্বরণের পরিমাণ বিরাট। এত পরিমাণ CO_2-কে শোষণ করবার ক্ষমতা পৃথিবীর থাকবে কি না সন্দেহ।

সরকার এবং বেশিরভাগ ধনী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলে থাকে যে ভারতের উন্নয়নের জন্য এই নিঃসরণ যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ভারতের উন্নতি প্রয়োজন তাই আমাদের নিঃসরণ বাড়বে। এমনভাবে এইসব কথা বলা হয় তাতে মনে হয় যে সমস্ত ভারতবাসীর উন্নয়ন ঘটবে এই নিঃসরণ বাড়লে। বাস্তবে এটি সত্য নয়। ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। ১,১২৭০০ মেগাওয়াট থেকে পৌঁছেছে ২,৩৪৬০০ মেগাওয়াটে। যদিও, ৩০.৪ কোটি মানুষের ঘরে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছয় নি। আজও ৮৭% আদিবাসী এবং ৭০% তফসিলি সম্প্রদায় তাদের শক্তির প্রয়োজন মেটায় কাঠ দিয়ে। বিশেষ করে রান্নার জন্য। দারিদ্র্যের কথা একটু ভাবা যাক। আগে বলা হত, যারা ২৪০০ ক্যালরির নিচে খাদ্য পায়, তারা দরিদ্র। এখন, দারিদ্র্য বুঝতে গেলে খাদ্যপ্রাপ্তি ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, শিশুমৃত্যু, মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা সূচকের কথা ভাবতে হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ঐ সূচক ধরলে ৬৯% মানুষ দারিদ্র্যে বাস করে। এটি তো গড় দারিদ্র্য। গ্রামের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে ৮৪% দারিদ্র্যে বাস করে। গত ২০ বছরে ৩০ লক্ষ কর্মী কাজ পেয়েছে। কিন্তু কর্মোপযুক্ত হয়েছে ১০ থেকে ১২ কোটি। অথচ, গত ১৫ বছরে বিলিওনিয়ারদের সম্পদ বেড়েছে ১২০ গুণ। বেশিরভাগ কর্মী নিযুক্ত হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ১৯৯৬-র তুলনায় ২০১২ সালে একজন কারখানার কর্মীর আয় কমে গিয়েছে।

সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের যে বিরাট দাবি, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। বিদ্যুৎ সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনে। কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে GHG নিঃসরণ ২০৩০ সালে তিন গুণ বেড়ে গেলেও তাদের অবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন হবে। যখন আমরা শ্রমিক শ্রেণী এবং বনবাসীদের ওপর মোদি সরকারের আক্রমণ দেখি তখন ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। বর্তমান এন ডি এ সরকার ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট এবং ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট-এর ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। সবচেয়ে খারাপ যে ব্যাপার তা হচ্ছে যাদের উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে (অর্থাৎ সমগ্র ভারতবাসী) তাদের মধ্যে যারা ব্রাত্য, গরিব তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে CO_2 নিঃসরণ বাড়ার ফলে। যেমন ঘটেছে ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ ঘটনায়, ২০০৫ সালের মুম্বইয়ের বন্যায় এবং সুন্দরবনে আয়লা বা উড়িষ্যার ঘূর্ণাবর্তে। নিঃসরণ বাড়ায় গরিব মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।

নিঃসরণ বাড়ায় লাভ কার— একটু হিসেব করা যাক। বাড়বাড়ন্ত ঘটছে ভারতের ৪ কোটি ধনী ও প্রায় ২০ কোটি উচ্চ মধ্যবিত্তের। Kotak Wealth Management জানাচ্ছে, ২৫ কোটি টাকা সম্পদযুক্ত গৃহস্থের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে আমাদের এই ভারতে যাদের সংখ্যা ২০১০ সালে ৬২০০০, ২০১১ সালে ৬১০০০, ২০১২-তে ১,০০,৯০০ এবং ২০১৩-১৪-তে ১, ১৭০০০। তাই যখন ভারত সরকার তার INDC-তে এবং কিছু কিছু এনজিও ভারতের মাথাপিছু CO_2 নিঃসরণ মাত্র ১.৫৬ টনের কথা বলে তখন তারা সবাইকে ধোঁকা দেয়। ক্রমান্বয়ে CO_2 নিঃসরণ বাড়িয়ে ফয়দা লুটছে ধনীরা। উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটাও জোটে নি গরিব মানুষের। বরং এই ৬৮ বছর স্বাধীনতায় যে উন্নয়ন ঘটেছে শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাতে ৬ কোটির বেশি মানুষ গৃহহারা, জমিহারা হয়েছে। মোদি সরকারের ঠাট্টার সীমা থাকে না যখন INDC বলে, 'This is because Indians believe in friendly

lifestyle and practices'। এই হাস্যকর কথা যখন বলা হয় তখন ১,৭৫০০০ গৃহস্থ যাদের সম্পদ ১০ লক্ষ ডলারের বেশি, তাদের জীবনশৈলী এবং CO_2 নিঃসরণের কথা বলা হয় না। মুম্বইয়ে ভারতের সবচেয়ে ধনী মানুষের ২৭তলা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তাতে বোধহয় ৩০টির বেশি গ্রাম আলোকিত করা যায়। ঐসব ধনী মানুষের CO_2 নিঃস্বরণ একজন গড় ইউরোপীয় বা মার্কিনির চেয়ে অনেক বেশি। অসীম শ্রীবাস্তব এবং আশিস কোঠারি তাঁদের 'Churning the Earth' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে ভারতের সবচেয়ে ধনী ১%-এর Ecological Footprint (বাস্তুতান্ত্রিক পায়ের ছাপ) ৪০% সবচেয়ে গরিব মানুষের চেয়ে ১৭ গুণ বেশি। ইতিহাসে প্রথম বিশ্বের CO_2 নিঃস্বরণ তৃতীয় বিশ্বের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি। ঠিক সেইরকম ভারতে আজ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে CO_2 নিঃস্বরণের পার্থক্যও একই রকমের। জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করবার জন্য INDC-এর যে প্রস্তাব সে ব্যাপারেও গরিব মানুষের কথা ভাবা হয় না। গরিব মানুষকে যদি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় তাহলে তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে হবে, খাদ্য সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে, জীববৈচিত্র্যকে উন্নত করতে হবে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। INDC-তে এ ব্যাপারে কোনো কথা নেই।

শক্তির চাহিদার অপরিমিত বৃদ্ধি

ধনী মানুষের সম্পদ বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও বিরাটভাবে বাড়ছে। INDC সে কথা বলছে। এই শক্তি কীভাবে সৃষ্টি হবে INDC non-fossil fuel -এর কথা বলছে। Renewable বা নবীকরণযুক্ত শক্তির কথা বলছে না। বলছে পরমাণু শক্তির কথা। ২০৩২ সালের মধ্যে ৬৩ gigawatt (gw) পরমাণু শক্তি উৎপাদিত হবে। যেখানে ৬০ বছরেরও বেশি প্রচেষ্টার পর মাত্র ১০ gw পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে বা হবে যদি যেসব পরমাণুচুল্লি নির্মিত হচ্ছে সেগুলি কার্যকর হলে। INDC এই পরমাণু চুল্লি সম্বন্ধে বলছে, 'a safe, environmentally benign and economically viable source।' আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ড, রাশিয়ার চের্নোবিল এবং জাপানের ফুকুসিমায় দুর্ঘটনার পর পরমাণু শক্তিকে 'safe' বলা অণৃতভাষণ। অর্থনীতির দিক থেকে উন্নত পৃথিবীর বহু দেশ পরমাণু চুল্লি আর স্থাপন করবে না বলে স্থির করেছে বা বন্ধ করে দিচ্ছে। ১৯৭৮ সালের পর আমেরিকা আর কোনো নতুন চুল্লির অর্ডার দেয় নি। তার মূল কারণ পরমাণু চুল্লির খরচ অনেক বেশি, এটা আদৌ নিরাপদ নয় এবং পরিবেশবান্ধবও নয়। বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না পরমাণু বর্জ্য, যা কিনা ভয়ানক তেজস্ক্রিয়,তা কী করে সরিয়ে রাখা যাবে। পরমাণুচুল্লিতে যে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম ২৩৯জি (PU 239) সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে কী করা হবে তাও আমরা জানি না। ভারতের যাদুগোড়ায় যে ইউরেনিয়াম খনি আছে, তার আশেপাশের গ্রামে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাচ্ছে। তাছাড়া পরমাণুচুল্লির খরচ বিরাট। আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানী এম ভি রমান্না তাঁর 'The power of promise : Examining Nuclear Energy in India' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'Every reactor constructed by the Department of Atomic Energy has experienced cost overruns' and 'importing 10000 MW of foreign reactor would cost trillions of rupees'। তাই আজকের যে জলবায়ু বিপর্যয় তার সমাধান পরমাণু শক্তি বৃদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়।

INDC জানাচ্ছে যে ভারত ১০০ GW-এর বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। এখন ভারতে যে ৪৬ GW জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেখানে ৪২ GW উৎপন্ন হয় বড় বাঁধ থেকে। যেহেতু ছোট ছোট micro-hydd প্রজেক্টের কথা নেই INDC প্রস্তাবনায় এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে ঐ পরিকল্পিত বিদ্যুৎ বৃদ্ধি আসবে বড় বড় বাঁধ থেকে। ভারতে এখন বিভিন্ন জায়গায় কয়েক ডজন বড় বড় বাঁধ নির্মাণ চলছে এবং নতুন বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। আর এইসব বাঁধের একটা বড় অংশ নির্মিত হচ্ছে বা হবে হিমালয়ের অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ বাস্তুতন্ত্রে। এইরকম বাঁধ যখন নির্মাণ হয় তখন বহু অরণ্যবাসী মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়, বাঁধের নীচের অংশে অবস্থিত গ্রামের অর্থনীতি এবং কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় বড় বাঁধের জলাধার থেকে মিথেন বেরোয় যা CO_2-এর চেয়ে প্রায় ২৪ গুণ বেশি GHG। তাই জলশক্তি 'পরিচ্ছন্ন' (ক্লিন) একথাটা একেবারেই অবান্তর।

তৃতীয়ত, INDC 'Clean Coal' এবং 'Clean energy'-এর কথা বলে। কয়লা খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। কয়লা যেসব জায়গায় পাওয়া যায় তা হয় জঙ্গল বা বসতি অঞ্চল। তাই কয়লা খনি বিস্তৃতির অর্থই হচ্ছে অরণ্য নিধন এবং বাস্তুচ্যুতি। INDC বলছে 'Coal will

dominate power generation in future' অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ খুব পরিবেশ বান্ধব বলে মনে হয় না। তা টেকসই নয়। কয়লা খনি যাতে সহজে শুরু করা যায় তাই সুরক্ষিত অরণ্যের পরিমাণ মোদি সরকার অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কয়লার ধোঁয়া এবং ফ্লাই অ্যাশ থেকে পারদ বিষক্রিয়া ঘটে। তাছাড়া অন্যান্য হেভি মেটাল যেমন আর্সেনিক, সীসা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। যার ফলে মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে। একটি বড় শক্তি কেন্দ্র যতদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকে তার মধ্যে বহু জীব প্রজাতি CO_2 নিঃস্বরণের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়। একথা জানিয়েছেন বিখ্যাত জলবায়ু বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন। আমরা জানি যে কয়লা খনি শিল্প বহু লক্ষ কর্মীর

ভারতে এখন বিভিন্ন জায়গায় কয়েক ডজন বড় বড় বাঁধ নির্মাণ চলছে এবং নতুন বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। আর এইসব বাঁধের একটা বড় অংশ নির্মিত হচ্ছে বা হবে হিমালয়ের অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ বাস্তুতন্ত্রে। এইরকম বাঁধ যখন নির্মাণ হয় তখন বহু অরণ্যবাসী মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়, অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়, বাঁধের নীচের অংশে অবস্থিত গ্রামের অর্থনীতি এবং কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় বড় বাঁধের জলাধার থেকে মিথেন বেরোয় যা CO_2-এর চেয়ে প্রায় ২৪ গুণ বেশি GHG। তাই জলশক্তি 'পরিচ্ছন্ন' (ক্লিন) একথাটা একেবারেই অবান্তর।

কর্ম সংস্থান করে। তাই জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবীকরণযুক্ত পরিস্রুত শক্তির ব্যবহার বাড়ানো যায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার আয়োজন এখনই করা প্রয়োজন। এইরকম শিল্পের বহু মানুষ কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে যারা হবে 'সবুজকর্মী'। এইসব প্রশ্ন তুলছে বেশ কিছু কর্মী ইউনিয়ন এবং এনজিও। কিন্তু INDC এবং সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

আমরা বিদ্যুতের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু, আমাদের ভাবতে হবে এই শক্তি আমরা কিসের জন্য ব্যবহার করব। মানবিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করে ধনী রাক্ষুসে ভোগবাদকে চরিতার্থ করার জন্য কি এত শক্তি উৎপাদন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে যা INDC প্রস্তাবে বলেছে। যে সোলার পার্ক এবং উইন্ড ফার্মের কথা বলা হচ্ছে তা বিরাটভাবে স্থাপন করতে গেলে তারও পরিবেশের ওপর খারাপ প্রভাব আছে। কারণ, ঐসব করতে গেলে চাষী এবং জমি অধিগ্রহণ করে তাদের বাস্তুচ্যুত করতে হবে। তাই, এটা খুব যুক্তিযুক্ত এবং আনন্দের হত যদি INDC প্রস্তাব দিত যে মানুষের ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন মেটাতে বিকেন্দ্রিক নবীকরণযুক্ত শক্তি উৎপাদন করা হবে। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে ৪০ শতাংশ শক্তি উৎপাদন করার পরিবর্তে। পরিবেশের সংরক্ষণের দিক থেকে নবীকরণযুক্ত শক্তি শুধু খুবই ভাল নয়। এই শক্তি স্থানীয় মানুষ নিজেরাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাছাড়া এইরকম শক্তি গরিব মানুষ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

CO_2-কে শোষণের ব্যবস্থা (Carbon Sink)

INDC অরণ্য সৃজন করে Carbon Sink-এর কথা বলছে তাও ক্ষতিকর হবে। INDC প্রস্তাব দিয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে অরণ্য সৃজন করে ২৫ থেকে ৩০ কোটি টন CO_2 equivalent Carbon Sink সৃষ্টি করবে। প্রতি বছর ১০ কোটি টন করে CO_2 equivalent শোষণ করা হবে। এটা করা হবে ৫০ লক্ষ হেক্টর নতুন অরণ্য সৃজন করে এবং আরও ৫০ লক্ষ হেক্টর ক্ষয়ে যাওয়া অরণ্যকে উন্নত করে (পৃ ১৬ এবং ২০)। এইসব অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যখন উন্নয়নের নামে বহু বছরের পুরনো অরণ্য নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের পর ৬ লক্ষ হেক্টর অরণ্য লোপাট হয়েছে খনি, শক্তি, চাষ, শিল্প, নগরায়ন, বড় বড় হাইওয়ে ইত্যাদির জন্য। যেটুকু অরণ্য সৃজন হচ্ছে তাও হচ্ছে একরূপী গাছ লাগিয়ে। তাকে অরণ্য বলা যায় না। এটা করার জন্যেও রাষ্ট্রের নিয়মকে লঙ্ঘন করে চাষির জমি দখল করা হচ্ছে। এছাড়া, মোদি সরকার প্রস্তাব করেছে যে ভারতে যে 'degraded' অরণ্য আছে তার ৪০ শতাংশ করপোরেট সেক্টরের হাতে তুলে দেবে। অর্থাৎ, সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে জমি আছে তাও দখল হয়ে যাবে।

ভারতের INDC-কে এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে

হবে। সব মিলিয়ে ১৪৮টি দেশ, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি CO_2 নিঃস্বরণ করে তারাও আছে। তারা, তাদের INDC UNFCC-এর কাছে দাখিল করেছে। এইসব প্রস্তাবনা আমাদের গ্রহের ওপর কী প্রভাব ফেলবে? আমেরিকা জানিয়েছে যে সে ২০০৫ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে তাদের CO_2 নিঃস্বরণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমিয়ে দেবে। Kyoto Protocal-এ Baseline বছর ছিল ১৯৯০। এখন তাকে সরিয়ে ২০০৫ সাল করা হয়েছে। যদি ১৯৯০-কে Baseline বছর ধরা হয় তাহলে আমেরিকা নিঃস্বরণ কমাবে মান ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। ২০১৩ সালে আমেরিকার CO_2 নিঃস্বরণ ১৯৯০ সালের তুলনায় ১.৪ শতাংশ বেশি ছিল। চীন প্রস্তাব দিয়েছে যে সে তার নিঃস্বরণ ২০০৫ সালের তুলনায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে দেবে। এত কমালেও ২০৩০ সালে তার নিঃস্বরণ দাঁড়াবে ১৩০০ থেকে ১৫০০ কোটি টনে। তাই, পৃথিবীর তিনটি সবচেয়ে বেশি CO_2 নিঃস্বরণকারী দেশের— আমেরিকা, চীন ও ভারত— নিঃস্বরণ আমাদের এই গ্রহ শোষণ করতে পারবে না।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান নিঃস্বরণকারী দেশ তাদের CO_2 নিঃস্বরণের যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ২০১২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টন CO_2 ছাড়বে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২°সি-এর বেশি হয়ে গেলে জলবায়ু বিপর্যয় ঘটবে। সমস্ত পৃথিবীর গরিব মানুষ বিপন্ন হবে। পৃথিবীর অন্যান্য জীবপ্রজাতি বিলুপ্ত হবে। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীতে ষষ্ঠ mass extinction আসন্ন। পঞ্চম এসেছিল আজ থেকে প্রায় ৬.৫ কোটি বছর আগে যখন ডাইনোসোররা বিলুপ্ত হয়েছিল। এবার মানুষই প্রথম বিলুপ্ত হবে বলছেন বিজ্ঞানীরা।

ভারত এবং অন্যান্য সব দেশ যে INDC জানিয়েছে তাতে কারুরই কোনো urgency দেখা যাচ্ছে না। পৃথিবীতে যবে থেকে তাপমাত্রার হিসেব রাখা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৪ সাল ছিল সবথেকে গরম বছর। সুইৎজারল্যান্ডের তাপমাত্রা ৩৮°সি।১৮৮০ সাল থেকে প্রতি মাসের তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা হচ্ছে। সুমেরুর বরফের স্তূপ গলে যাচ্ছে। ঐ বরফের নীচে যে বহুকালের মিথেন যাকে calthrage বলে, তা ছাড়া পাচ্ছে। এর ফলে তাপমাত্রায় বড় প্রভাব পড়ছে। ডিসেম্বর মাসে প্যারিস শহরে যে COP 21 বসল বটে, তবে আলোচনা সেই থোড় বড়ি খাড়া। হবে নাই বা কেন, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির চালক হচ্ছে কর্পোরেট বিশ্ব। পুঁজিবাদের ধর্মই হচ্ছে ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি। তাই শক্তির প্রয়োজন প্রতি বছর প্রায় ২ শতাংশ বাড়ছে। আর সেই শক্তি আসছে প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। শক্তি উৎপাদন কমিয়ে দিলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভেঙে পড়বে।

এই যে জলবায়ু বিপর্যয়ের সমস্যা তা প্রযুক্তি দিয়ে সমাধান করা যাবে না। পৃথিবীতে এই যে লক্ষ লক্ষ রকমের জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে ধনী মানুষের চরম ভোগ লালসা মেটাবার জন্য, যার বেশিরভাগটাই মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, তাকে যদি আমরা বদলাতে না পারি তাহলে পৃথিবীর এই সঙ্কট সমাধান করা সম্ভব নয়। সঙ্কট শুধু প্রকৃতিতেই নয়, সমাজও গভীর সঙ্কটে। ধনী-দরিদ্রের আয়ের পার্থক্য বাড়ছে। হিংসা বাড়ছে। পৃথিবীর এই সামাজিক ও প্রাকৃতিক সঙ্কটকে মোকাবিলা করতে হলে সমাজটাকে পাল্টাতে হবে। এক সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভোগবাদহীন সমাজ গড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'না রে না হবে না তোর স্বর্গ সাধন যতই করিস সুখের সাধন'। এই সমাজও এমনিতে আসবে না। এই নতুন সমাজ সৃষ্টি করার জন্য চাই সঙ্ঘর্ষ ও নির্মাণ। সঙ্ঘর্ষ সমস্ত ব্রাত্য মানুষকে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে চলবে নির্মাণের কাজ নানা ক্ষেত্রে ঃ কৃষি, জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিকল্প সংস্কৃতির বীজ শিশু ও মানুষের মনে রোপণ করা। প্রকৃতির প্রভু না হয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, প্রকৃতির অংশ হওয়া। মনে রাখতে হবে দার্শনিক ও গণিতবিদ ব্লেইজ পাসকাল (জন্ম - ১৬২১)-এর কথা, ''Human kind is only a very small link in the immense web of nature, but it is the only one that through thought understand nature; it is the only species on earth to be responsible for the earth and will be able to transform it for the better or for worse."

''বিপুলা এই প্রকৃতির জালে ক্ষীণভাবে জড়িয়ে আছে মানবজাতি, সে অস্তিত্ব নগণ্য হলেও একমাত্র মানুষই পারে চিন্তাশক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে জানতে বা বুঝতে। তাই প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্বও মানুষকেই নিতে হবে, এ কাজ জীবজগতের অন্য কোনো প্রাণীর নয়।"

তথ্যসূত্র ঃ **Economic & Political Weekly**

রোগ না হলেও অ্যাসপিরিন?

গৌতম মিস্ত্রি

'অ্যাসপিরিন মানব সভ্যতার বড় আশীর্বাদ' এই উক্তিটির প্রবক্তা 'রায় পোর্টার' তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে 'The Greatest Benefit to Mankind : A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present' লিখে গেছেন— অ্যাসপিরিনের ব্যবহার অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ থেকে ৩৭৭ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিসের লিপিতে মাথাধরা, ব্যথা ও জ্বরের চিকিৎসায় উইলো গাছের ছাল থেকে তৈরি করা পাউডার বা অ্যাসপিরিনের প্রাকৃতিক উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে জার্মান কোম্পানি 'বেয়ার'-এর রসায়নবিদ ফেলিক্স হফমান সর্বপ্রথম অ্যাসিটিল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড বা অ্যাসপিরিন আবিষ্কার করেন তাঁর বাবার বাতের ব্যথার উপশমের জন্য। এর ন বছর পরে ঐ ওষুধ নির্মাতা বাণিজ্যিকভাবে অ্যাসপিরিন তৈরি শুরু করে। প্রথমে ব্যথা নিবারণের জন্য উদ্ভাবন হলেও, বর্তমানে হার্ট অ্যাটাক ও সেরিব্রাল স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্য এর ব্যবহার অনেক বেশি। যুক্তিসঙ্গত বিরূপ কোনো কারণ না থাকলে হৃদরোগে ও মস্তিষ্কের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধা জনিত স্ট্রোকে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার না করাটাই এখন চিকিৎসায় গাফিলতি বলে গণ্য হয়।

হায়দারাবাদে একটা মেডিক্যাল কনফারেন্সে হাজারদুয়েক হৃদরোগবিশেষজ্ঞ জমায়েত হয়েছিলেন বছর আটেক আগে। মূল শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে রামোজি ফিল্ম সিটিতে কনফারেন্সে। নামেই 'ফিল্ম সিটি', কোনো দোকানপাট নেই। হঠাৎ লাউড স্পিকারে ঘোষণা— কোনো এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের বুকে ব্যথা হচ্ছে। কাছেপিঠে কোনো ওষুধের দোকান বা হাসপাতাল নেই, যদি কারো কাছে অ্যাসপিরিন থাকে তার জন্য কাতর আবেদন। আর একবার ট্রেনে সফর করছি, এক যাত্রীর বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তাঁর আত্মীয়া একটি অ্যাসপিরিনের বড়ির জন্য এক কামরা থেকে অন্য কামরা ছুটে বেড়াচ্ছেন,২৭ পয়সা দামের একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের জন্য! বুকে ব্যথা হলে ক্বচিৎ কদাচিৎ হৃদরোগ হতে পারে। সম্ভাবনা অল্প হলেও কেবল অনুমানের বশে ঐ কমদামি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের প্রয়োজন সবার আগে। হৃদরোগে আক্রন্ত হলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে এই কমদামি ওষুধটি।

অ্যাসপিরিন বা ডিস্পিরিন হল আমাদের পরিচিত মাথাব্যথার ওষুধ— যেটা কিনা সর্বঘটের হরিতকী। মাথাব্যথা হলে এখন এটা কমই ব্যবহার হয়। অ্যাসপিরিনের প্রয়োগ এখন বহুমাত্রিক। হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক বা ডায়াবিটিস ইত্যাদি অসুখের ওষুধের লিস্টে অ্যাসপিরিন থাকবেই। প্রচলিত ধারণা, এই ওষুধটি রক্ত পাতলা করে। এটি সঠিক নয়। এটি রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়, রক্তের ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকে। অ্যাসপিরিনের এই যাদুর কথা একটু বুঝে নেওয়া যাক। হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ইত্যাদি আদতে রক্তনালীর রোগ। রক্তনালীর মাধ্যে কোলেস্টেরল, অণুচক্রিকা সহ 'অ্যাথেরোস্কলেরোটিক প্লাক' তৈরি করে রক্তনালীকে সরু ও সক্রিয় করে তোলে। ফলে হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো মারাত্মক রোগের সূত্রপাত হয়। অ্যাসপিরিন এই 'অ্যাথেরোস্কলেরোটিক প্লাক' তৈরি হওয়া ঠেকাতে পারে না। অ্যাথেরোস্কলেরোটিক প্লাকের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে গিয়ে ওর ওপরে রক্ত জমাট বেঁধে ঐ সব রোগের অন্তিম পরিণতি হিসেবে হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো মারণাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অ্যাসপিরিন রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দিয়ে এই সব রোগের ঐরকম মারণাত্মক পরিণতির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

শরীরে হৃদরোগ তার অস্তিত্ব জানান দিলে অ্যাসপিরিনের প্রয়োগের অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু অধিক সচেতন হয়ে কেউ যদি হৃদরোগ শুরু হবার আগেই অ্যাসপিরিন খাওয়া শুরু করতে চান তবে তার যৌক্তিকতা খুঁজে দেখতে হবে। রোগ শুরু হবার

পরে, অদূর ভবিষ্যতে তার থেকে সম্ভাব্য অধিক ক্ষতি হিসেবে হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য অ্যাসপিরিনের ব্যবহারকে দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষা (সেকেন্ডারি প্রিভেনশন) বলে। হৃদরোগ শুরু হবার পূর্বেই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া তথা হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য অ্যাসপিরিনের ব্যবহারকে প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা (প্রাইমারি প্রিভেনশন) বলে। প্রথমটা সর্বজনগৃহীত এবং এর উপকারিতা বহু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত। দ্বিতীয়টা, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসেবে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার বিতর্কিত; এর আলোচনাও জটিল। ইদানীংকালে অ্যাসপিরিনের আর এক প্রয়োগ জানা গেছে। সাম্প্রতিককালের বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে যে, বৃহদান্ত্র সহ অনেক ক্যান্সার প্রতিরোধে অ্যাসপিরিন ও অন্যান্য স্টেরয়েডবিহীন প্রদাহ প্রশমনকারী ওষুধ (এনএসএআইডি) প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসেবে বেশ কার্যকর। এই তথ্যগুলো যত জোরালো হবে প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসেবে, অ্যাসপিরিনের প্রয়োগ তত মান্যতা পাবে। এই নিবন্ধে আমরা কেবল হৃদরোগে মৃত্যু এড়াতে আপাতসুস্থ ব্যক্তির অ্যাসপিরিনের ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে হৃদরোগে অ্যাসপিরিনের কর্মপদ্ধতি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, উপলব্ধ তথ্যপ্রমাণ, প্রচলিত নির্দেশিকা জেনে নেওয়া যাক।

হৃদরোগে অ্যাসপিরিনের কর্মপদ্ধতি

হৃদরোগের মারাত্মক আঘাত হল অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোম। সহজ করে বললে, হার্ট অ্যাটাক। এই দুর্ঘটনায় রক্তের অণুচক্রিকা বা প্লেটলেটের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে, যেটি না হলে হার্ট অ্যাটাক হবেই না। হার্ট অ্যাটাকের শুরুর আগে সেই দুর্ঘটনার কুশীলবরা সব হাজির হলে পরে অণুচক্রিকা সক্রিয় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে (অণুচক্রিকাগুলো) জোট বাঁধে, রক্ত জমাট বাঁধার প্রোটিন যৌগ ও ফিব্রিনকে উত্তেজিত করে আংশিক সরু হয়ে যাওয়া হৃদপেশির রক্তনালিতে সদ্য জমাট বাঁধা রক্ত দিয়ে রক্তনালীকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। ওষুধ হিসাবে অ্যাসপিরিন অণুচক্রিকার এই সক্রিয়তাকে বাধা দেয়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ব্যথার উপশমের জন্য সাধারণত ৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিনের প্রয়োজন হয়। হার্ট অ্যাটাক নিবারণের জন্য কম মাত্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম হলেই কাজ হয়। যদিও বেশি মাত্রার অ্যসপিরিনেও হৃদরোগে একই কাজ হবে। হৃদরোগের জন্য কম মাত্রার অ্যাসপিরিনের ডোজকে (৭৫ মিলিগ্রাম থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম) 'লো ডোজ অ্যাসপিরিন' বলে উল্লেখ করা হয়। কম মাত্রার অ্যাসপিরিন পাকাপাকিভাবে অ্যাসিটাইলেসন বিক্রিয়ার দ্বারা অণুচক্রিকার 'সাইক্লোঅক্সাজেনেজ-১' (cyclooxygenase-1, COX-1) উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে 'থ্রম্বক্সেন এ ২' (thromboxane A 2)-র উৎপাদন কমিয়ে দেয়। থ্রম্বক্সেন-এ-২-এর অভাবে অণুচক্রিকা সক্রিয় হয়ে রক্ত জমাট বাঁধায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। অণুচক্রিকার এই অংশগ্রহণ রক্ত জমাট বাধায় অপরিহার্য বলে, হার্ট অ্যাটাকের অন্যান্য উপাদান মজুত থাকলেও সেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না। ঘটনাচক্রে জেনে রাখা যাক, বেশি মাত্রার অ্যাসপিরিন সাইক্লো-অক্সাজেনেজ-১-এর সাথে সাথে সাইক্লা-অক্সাজেনেজ-২-এর মাত্রাও কমিয়ে দেয়। সাইক্লো-অক্সাজেনেজ-২ (COX-2) প্রস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে জ্বর ও ব্যথা কমায়। সাইক্লো-অক্সাজেনেজ-১ বাড়া-কমা ছাড়াও অ্যাসপিরিন প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাইটোকাইন ও সি রিঅ্যাক্টিভ নিয়ন্ত্রণ করে, আর রক্তনালীর স্বাস্থ্যবর্ধক নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধি করে।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধের ফারাক কেন?

কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে ওষুধ প্রয়োগের সময় কেবল ভাবতে হয়, ওষুধের কর্মক্ষমতা আর তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তুলনামূলক বিচারের কথা। এটা দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষার জন্য ওষুধটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বনাম রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অতিরিক্তভাবে বিচার্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি আবার সুস্থ মানুষের রোগ সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু আপাতসুস্থ মানুষের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা সংখ্যার দিক দিয়ে বড়ই কম, তাই আনুপাতিক হারে যে কোনো ওষুধের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে কম হতে বাধ্য। আর এই কম পরিমাণের প্রাপ্তির বেলায় কেবল ওষুধের খরচের কথাই ভাবলে চলে না, সেই লাভটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়েও বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অ্যাসপিরিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়েই।

গোলাপের সঙ্গে কতটা গোলাপের কাঁটা সহনীয়?

অ্যাসপিরিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মামুলি ও অকিঞ্চিৎকর

হলে এই নিবন্ধ লেখার প্রয়োজন হত না। অ্যাসপিরিনের মতো একটি সস্তার ওষুধ, যত কম উপকারই হোক না কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা নুনের সঙ্গে আয়োডিন খাওয়ার মতো করে, রোজ একটি করে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেতে পারত। সেটা করা যাচ্ছে না অ্যাসপিরিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য। যে কোনো ওষুধের বা চিকিৎসার এই তুল্যমূল্য বিচারকে পরিভাষায় 'বেনিফিট রিস্ক রেসিও' বলে। যথেচ্ছ ব্যবহারের অসুবিধা তিনটি ঃ প্রথমত, পাকস্থলীতে প্রদাহ ও ক্ষত সৃষ্টির জন্য পেটে ব্যথা ও পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণের অসুবিধা, যেটা হয়ত অনেকেই জানেন। দ্বিতীয়, অসুবিধা হিসাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের প্রবণতা অ্যাসপিরিনের এক মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ২৪টি চিকিৎসা অনুসন্ধানের সম্মিলিত বিশ্লেষণে জানা যাচ্ছে, অ্যাসপিরিনের জন্য পাকস্থলীতে ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা যথাক্রমে ০.৬% ও ০.৩%। হৃদরোগে ভোগা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর চেয়ে উপকার চেয়ে অনেক বেশি বলে অ্যাসপিরিনের ব্যবহারে কোনো দ্বিমত নেই। কেবল যদি হৃদরোগ আমাদের অজ্ঞাতসারে গোকুলে বাড়তে থাকে, অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে অথবা যদি ভবিষ্যতে হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকে তবে তার এক সম্ভাব্য মারাত্মক ফলশ্রুতি হিসাবে হার্ট অ্যাটাক নিবারণের জন্য অ্যাসপিরিন ব্যবহার সঙ্গত কি না সেই বিচারটা ততটা সোজাসাপ্টা নয়। পাকস্থলীতে প্রদাহ নিবারণকারী ওষুধ হিসাবে অ্যান্টাসিড বা পাকস্থলী থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী 'প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর' বা এইচ-২ রিসেপ্টর ব্লকারের সাথে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার নিরাপত্তার জন্য দরকার, এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে। যদিও এর খরচ-প্রাপ্তির অনুকূলে প্রামাণ্য তথ্য নেই। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ (Guidelines from the American College of Gastroenterology, 2009) মনে করেন, ৬৫ বৎসরের অধিক বয়সের ব্যক্তি, যাঁদের পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণের পূর্ব ঘটনা জানা আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিনের সঙ্গে প্যান্টোপ্রাজোল (একটি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর) ব্যবহার করলে ভাল হয়।

যথেচ্ছ অ্যাসপিরিন ব্যবহারের তৃতীয় অসুবিধা, অ্যাসপিরিনের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা (Aspirin sensitivity) যেটা কাম্য নয়। অ্যাসপিরিন ব্যবহারের ফলে ১০ হাজার জনে ৭ থেকে ২০ জনের 'আমবাত' বা আরটিকেরিয়া আর অ্যাঞ্জিওইডিমা দেখা যায়। কারও কারও ফুসফুসের বায়ু চলাচলের নালীতে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা বা অ্যাস্থমার (asthma) জন্য অ্যাসপিরিন ব্যবহারে ইতি টানতে হয়।

প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষায় অ্যাসপিরিন ব্যবহারের লাভ ও ক্ষতির তুল্যমূল্য বিচার ঃ

এটা নির্ণয়ের জন্য আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালিয়ে যে ফলাফল পেয়েছেন, সেগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে। গুরুগম্ভীর, সংখ্যাভারে ভারাক্রান্ত সেই বিশ্লেষণের শেষ কথা এরকম ঃ ১) হৃদরোগের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে এমন ব্যক্তিদের হার্ট অ্যাটাক বা অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোম প্রতিরোধের জন্য দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষা হিসাবে অ্যাসপিরিন ২০% আপেক্ষিক নিরাপত্তা (relative risk reduction) দেয়, যেটা কিনা অ্যাসপিরিনের জন্য মস্তিষ্কে প্রাণঘাতী রক্তক্ষরণের সম্ভাবনার (১ থেকে ৪%) থেকে অনেক বেশি। তাই এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন প্রয়োগে কোনো দ্বিধা নেই। প্রতিরোধকারী চিকিৎসা প্রযুক্তির মূল্যায়নের কালে যে প্রাপ্তিগুলো বিশেষ করে বিচার্য, সেগুলো হল ঃ ক) হার্ট অ্যাটাক ঠেকানো, খ) হৃদরোগে মৃত্যু এবং গ) সেরিব্রাল স্ট্রোক নিবারণ। দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষা হিসাবে অ্যাসপিরিনের প্রয়োগ কেবল হার্ট অ্যাটাকই প্রতিরোধ করে না; তুল্যমূল্যের বিচারে এটা হৃদরোগে মৃত্যু ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত সুরক্ষা দেয়। ২) হৃদরোগের কোনো অস্তিত্ব নেই এমন ব্যক্তিদের (প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে) অ্যাসপিরিন অল্প হলেও প্রথম হার্ট অ্যাটাকটাকে ঠেকাতে কিছুটা কাজ দেয়। অর্থাৎ প্রথম (যার কোনোদিন হার্ট অ্যাটাক হয় নি) হার্ট অ্যাটাকের প্রতিরোধের জন্য প্রাথমিক প্রতিরোধে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। তবে, এই ধরনের ব্যক্তিদের হৃদরোগজনিত মৃত্যু ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা অ্যাসপিরিন কমাতে পারে না। এ ছাড়াও প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা প্রযুক্ত হওয়া আপাতসুস্থ ব্যক্তিদের হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে কম (<৫%) বলে অ্যাসপিরিনের জন্য সব মিলিয়ে ক্ষতি কমানোর গড়পড়তা হারও অনেক কম

(<১%)। এই ব্যক্তিদের অ্যাসপিরিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে রক্তক্ষরণজনিত ঝুঁকি অবশ্য হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মতোই থাকবে। হিসাব কষে দেখা গিয়েছে যে, একটি জনগোষ্ঠীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১০ বছরে মৃত্যুর ঝুঁকি (অ্যাসপিরিন কেবল এটাই কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে) যদি ৬ থেকে ১০%-এর বেশি না হয়, তবে অ্যাসপিরিন প্রয়োগে সুস্থ ব্যক্তির সামগ্রিক কোনো লাভ নেই। এ ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ জনিত ঝুঁকি লাভের চেয়ে বেশি। ৩) বয়স বাড়ার সাথে সাথে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি আর রক্তক্ষরণ জনিত ঝুঁকিও সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। হৃদরোগের অন্যান্য উপাদান মজুত থাকলে হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি বেড়ে যায় বলে আপাতসুস্থ ব্যক্তিদের প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষার জন্য অ্যাসপিরিনের ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবে স্থির করতে হয়। আপাতসুস্থ ব্যক্তির ভবিষ্যতের হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা নির্ণয়ের বিধিসম্মত নির্দেশিকা আছে, যেমন ফ্রামিংহাম রিস্ক ক্যালকুলেটর (http://www.mdcalc.com/framingham-coronary heart disease risk score)। আসলে আপাতসুস্থ ব্যক্তির হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে কি না তা নির্ণয়ের একাধিক পদ্ধতি আছে। প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে অ্যাসপিরিনের ব্যবহারের আগে সেই সমস্ত নির্ণায়ক বিচার করেই ঝুঁকি স্থির করে নিতে হয়। ঝুঁকি বেশি হলে তবেই অ্যাসপিরিন ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। যেমন, ডায়াবেটিসে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি বলে কিছু নির্দেশিকা অনুযায়ী (American College of Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis guideline on the Primary and secondary prevention of cardiovascular disease, 2012) হৃদরোগ না থাকলেও অ্যাসপিরিন ব্যবহারের পক্ষে রায় দিচ্ছে (প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে)। ইউরোপিয়ান নির্দেশিকা (European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, 2012) অবশ্য এই নির্দেশিকার বিপরীত মত পোষণ করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে অ্যাসপিরিন ঃ

হৃদরোগে মৃত্যু প্রতিরোধের সাথে সাথে ক্যান্সারের রোগ প্রতিরোধেও অ্যাসপিরিনের ভূমিকা থাকতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাসপিরিন ও সমগোত্রীয় স্টেরয়েড নয় এমন অন্যান্য প্রদাহ নিবারণকারী ওষুধ (non-steriodal antiinflammotory drugs, NSAID) বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার ও রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া (metastasis) ক্যান্সারে মৃত্যুহার কমায় বলে জানা যাচ্ছে।[২,৩] হৃদরোগের প্রতিরোধের জন্য অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সময় ক্যান্সারে মৃত্যুর বিষয়েও তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী, অতি অল্প হলেও, অ্যাসপিরিনে ক্যান্সার জনিত মৃত্যু কমায় বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত মতামতে পৌঁছনোর জন্য অ্যাসপিরিনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের অনুসন্ধানের প্রয়োজন, তাই এই মুহূর্তে প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধের জন্য অ্যাসপিরিনের প্রয়োগের নির্দেশিকা কেবল হৃদরোগ নিবারণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে।

একনজরে ঃ

হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চেয়ে আপাতসুস্থ ব্যক্তির হৃদরোগ ও সমগোত্রীয় অন্যান্য রোগে মৃত্যু রোধের জন্য অ্যাসপিরিনের ব্যবহারের বিষয়টা বেশ জটিল। বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী, আপাত সুস্থ ব্যক্তি, যাদের হৃদরোগ ও সমগোত্রীয় রোগের ঝুঁকি বৈশিষ্ট্যগত কারণে বেশি, তাদের জন্য কোনো সাধারণ সমীকরণ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যক্তিবিশেষের জন্য আলাদা করেই সেটা ঠিক করতে হয়। অ্যাসপিরিনের ব্যবহার স্থিরীকৃত হলে, ৭৫ অথবা ৩২৫ মিলিগ্রাম একই ফল দেবে। মোটামুটিভাবে অ্যাসপিরিন প্রাণনাশকর নয় এমন হৃদরোগে মৃত্যুহার কমায়, কতিপয় ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করে আর হৃদরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মোট মৃত্যুহার কমায়। এই প্রাপ্তির জন্য অবশ্য অ্যাসপিরিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ মামুলি অথবা আশঙ্কাজনক রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বহন করতে হয়।

আপাতসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষার অঙ্গ হিসাবে অ্যাসপিরিনের সম্ভাব্য লাভ অনেকটা কম, কারণ, এইসকল ব্যক্তির হৃদরোগের সম্ভাবনা এমনিতেই অনেকটা কম। অ্যাসপিরিনের রক্তক্ষরণের ঝুঁকি আপাত সুস্থ ব্যক্তির কিছুটা অল্প হলেও (হৃদরোগে আক্রান্ত রুগীদের চেয়ে) আনুপাতিক দিক দিয়ে বেশ কিছুটা থাকে।

প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষার বর্তমান নির্দেশিকা মোতাবেকে, ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তার হৃদরোগের সম্ভাবনা ও অ্যাসপিরিনের রক্তক্ষরণের ঝুঁকির খোলাখুলি ও নিরপেক্ষ আলোচনা করা ও পরামর্শ প্রার্থী ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা চিকিৎসকের দায়িত্ব।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে সেগুলি হল হৃদরোগের প্রাণান্তকর দুর্ঘটনা, হৃদরোগে ও অন্যান্য রোগে মৃত্যুর ঝুঁকি, ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ও অ্যাসপিরিনের জন্য রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশোর্ধ্ব হৃদরোগের বহুবিধ উপাদানের (যেমন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল ইত্যাদি) জর্জরিত কিন্তু সুস্থ ব্যক্তিদের অল্প মাত্রায় (প্রতিদিন ৭৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম) অ্যাসপিরিনের রক্তক্ষরণের ঝুঁকির চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি। এঁরা অ্যাসপিরিন ব্যবহার করতেই পারেন। রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেশি হলে, বা রক্তক্ষরণের ঝুঁকি অবাঞ্ছিত হলে (যেমন বিরল রক্তের গ্রুপ বা প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ) অ্যাসপিরিন পরিহার করাই উচিত। ক্যান্সার প্রতিরোধে অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতার স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেলেও, প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতভাবে অ্যাসপিরিনের নির্দেশিকা পুনর্লিখিত হবে।

হৃদরোগে মৃত্যু রোধের জন্য আপাতসুস্থ ব্যক্তির অ্যাসপিরিনের ব্যবহারের (প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষার) বর্তমান নির্দেশিকাগুলি (US Food and Drug Administration (FDA) 2014)

১) আপাতসুস্থ ব্যক্তির হৃদরোগে মৃত্যু রোধের জন্য অ্যাসপিরিন প্রয়োগ করতে চাইলে এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা করেই স্থির করা উচিত, কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর চোখ বুজে প্রয়োগ করা যায় এমন কোনো সাধারণ নির্দেশিকা নেই। ২) পঞ্চাশোর্ধ কোনো ব্যক্তির সুপ্ত হৃদরোগের আভাস না থাকলে আর রক্তক্ষরণের অতিরিক্ত প্রবণতা না থাকলে, ৭৫ মিলিগ্রাম থেকে ১০০ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিনের ব্যবহারের লাভ অ্যাসপিরিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি। এই ব্যবহারের ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি আপেক্ষিকভাবে ২০% কমানো সম্ভব, সেরিব্রাল স্ট্রোকের ঝুঁকি অপরিবর্তিত থাকে। এরই সাথে সাথে আগামী ৮ থেকে ১০ বৎসরব্যাপী সময়ে কমপক্ষে ১২ শতাংশ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমবে। যদিও এর সঙ্গে ৫০% আপেক্ষিক ও মৃদু (প্রাণনাশকারী নয়) রক্তক্ষরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। সম্ভাব্য আপেক্ষিক ৬ থেকে ৮ শতাংশ মোট মৃত্যুহারও কমবে। এই মৃত্যুহার হ্রাসের সংখ্যাটি আপেক্ষিক। আপাত সুস্থ মানবগোষ্ঠীতে মৃত্যুহার যথেষ্ট কম বলে, আপেক্ষিক মৃত্যুহারের সংখ্যাটা মোট মৃত্যুহারে হিসেব কষলে সেটা যথেষ্ট কমই দাঁড়াবে। সেই লাভের খতিয়ানটা এইরূপঃ ৬০ বৎসর বয়সের ১০০০ জন আপাত সুস্থ ব্যক্তি, যাদের আগামী দশ বছরে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ১০ থেকে ২০ শতাংশ, আর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আগামী ১০ বছরে ১২ শতাংশ, ১০ বছর ধরে অ্যাসপিরিন ব্যবহার করে গেলে, মাত্র ৬টি মৃত্যু রোধ করা যাবে, ১৭টি মৃদু (প্রাণনাশকারী নয়) হার্ট অ্যাটাক আটকানো যাবে, ৬টি ক্যান্সার ঠেকানো যাবে। তবে কোনো সেরিব্রাল স্ট্রোক হওয়া রোধ করা যাবে না। এরই সঙ্গে, ১৬ জনের মস্তিষ্কে, পাকস্থলীতে ও অন্যত্র আশঙ্কাজনক রক্তক্ষরণের ঝুঁকি নিতে হবে, যাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে অথবা রক্ত দিতে হবে। সংখ্যাতত্ত্বের এই হিসাবটা যথেষ্ট রক্ষণাত্মক (এর চেয়ে বেশি নয়)। রক্তক্ষরণের ঝুঁকিগুলি সাধারণত প্রথমের দিকেই হয়; যাদের সেটা হচ্ছে না, তাদের পরবর্তীকালে এই সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়। অথচ, অ্যাসপিরিনের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকে ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে অ্যাসপিরিনের উপকারগুলি পুঞ্জিভূত হয়ে সারা জীবনের রোগ প্রতিরোধের মোট হিসেবটা যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি লাভের এই অনুমানের স্বপক্ষে এখনও কোনো প্রমাণ বৈজ্ঞানিকদের কাছে মজুত নেই। এটা নিছক অনুমান সাপেক্ষ হিসেব। কোয়ালিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ-ইয়ার (QALY) নামে যে লাভক্ষতি নির্ণয়ের অঙ্ক আছে, তাতে পরিমাণগত আয়ুর সাথে গুণগত জীবনের মান একসাথে করে হিসেব করা হয়। কতটা অর্থ আর উদ্যম ব্যয় করা হচ্ছে আর কতটা কোয়ালিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার প্রাপ্তি হচ্ছে তার হিসেবে ৮১ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন ব্যবহার করে ৪৫ বৎসরের এক ব্যক্তি যদি ৫০০০০ আমেরিকান ডলারের সমতুল্য কোয়ালিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার পেতে চায়, তার হৃদরোগে মৃত্যুর আশঙ্কা অন্তত ২.৫ থেকে ৫ শতাংশ হতে হয়। ৩) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তির হৃদরোগে মৃত্যুহার হ্রাসের সাথে রক্তক্ষরণের ক্ষতির আশঙ্কা তুল্যমূল্য বিচার করেই অ্যাসপিরিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এই মূল্যায়নের পরে চিকিৎসকের দায়িত্ব

হবে ব্যক্তির সাথে তার বোঝার মতো করে সেটার বিশদ আলোচনা করা। কারণ এই সিদ্ধান্ত আজীবন অ্যাসপিরিন ব্যবহারের, ক্ষণিকের জন্য নয়। ঐ ব্যক্তিটির হৃদরোগের সম্ভাবনা সঠিক করে মূল্যায়ন করার বিধিসম্মত নির্দেশিকা আছে, নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট আছে (www.cvdrisk.nhlbi.nih.gov), নিঃশুল্ক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন (Framinham Risk Calculator, ASCVD risk estimator) আছে। এ সব বুঝেশুনে কেউ যদি বোঝে যে যৎসামান্য লাভের জন্য প্রতিদিন আজীবন ধরে অ্যাসপিরিন ব্যবহারের ঝক্কি ও ঝুঁকি অনেক, তবে সেই ব্যক্তি অ্যাসপিরিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নাও নিতে পারে। দু'একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। কোনো কোনো পরিবারে অনেক সময় বৃহদান্ত্রের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। চিকিৎসকের দায়িত্ব এটা সেই পরিবারের ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বলা, যে এ ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন প্রয়োগের লাভ ঝুঁকির চেয়ে অনেক বেশি। যে ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, ধূমপানে আসক্ত, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি বা পরিবারে অন্য সদস্যদের কম বয়সে হৃদরোগের ঘটনা জান্ন আছে তার হৃদরোগ সেই মুহূর্তে না থাকলেও ভবিষ্যতে হৃদরোগের আশঙ্কা যথেষ্ট বেশি। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর এক বা একাধিক সমাবেশ থাকলে প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার সঙ্গত। ৪) প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা হিসাবে অ্যাসপিরিনের ব্যবহারে আমেরিকান চিকিৎসকরা এক উদারপন্থী মতে বিশ্বাসী (2012 guidelines from the American College of Chest Physicians (ACCP), যেখানে ইউরোপিয়ান চিকিৎসকগণ কিছুটা রক্ষণশীল (2012 guidelines from the European Society of Cardiology)। ৫) যে সকল ব্যক্তিদের অন্য কোনো কারণে রক্ত জমাট বাঁধা নিবারণ করে (অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট) এমন ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, তাদের অ্যাসপিরিন ব্যবহার মানা।

তথ্যসূত্র

1. The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present Book review, BMJ 1998;316:713.
2. Algra AM, Rothwell PM. Effects of regular aspirin on long-term cancer incidence and metastasis: a systematic comparison of evidence from observational studies versus randomised trials. Lancet Oncol 2012; 13:518.; Rothwell PM, Wilson M, Price JF, et al. Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis: a study of incident cancers during randomised controlled trials. Lancet 2012;379:1591.
3. Cuzick J, Thorat MA, Bosetti C, et al. Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population. Ann Oncol 2015; 26:47.
4. Pignone M, Earnshaw S, McDade C, Pletcher MJ. Effect of including cancer mortality on the cost effectiveness of aspirin for primary prevention in men. J Gen Intern Med 2013; 28:1483.
5. Seshasai SR, Wijesuriya S, Sivakumaran R, ey al. Effect of aspirin on vascular and nonvascular outcomes: Meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2012; 172:209.
6. Antithrombotic Trialists (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, et al. Aspirirn in the primary and secondary prevention of vascular disease: Collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009; 373:1849.
7. Raju N, Sobieraj - Teague M, Hirsh J, ey al. Effect of Aspirin on Cardiovascular and All Cause Mortality in Primary Prevention of Cardiovascular Disease : A Meta-Analysis of Randomizes Controlled Trials. AMJ.

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উয়ুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

নিবেদিতার আধ্যাত্মিকতাই কী তাঁর একমাত্র পরিচয়?

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদিতাকে আমরা একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখতেই আগ্রহী। আমরা তাঁকে বিবেকানন্দর ভাবশিষ্যা বলে গণ্য করি। কিন্তু আমরা যদি নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের দিকে নজর করি তাহলে লক্ষ্য করব যে তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিবেদিতপ্রাণা। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি যেমন প্রয়োজন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনও একইভাবে জরুরি। তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বার্থে এমনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর এই কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ না করতে পারলে তাঁর কোনো সঠিক মূল্যায়নই সম্ভব নয়। এই মূল্যায়ন না হলে তিনি হয়ে থাকবেন কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যাবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জনগণের দারিদ্র ও ক্লেশ স্বামী বিবেকানন্দকে যারপরনাই ব্যথিত করেছিল। তিনি মনে করতেন শিক্ষা প্রদানের মধ্যে দিয়েই সমসাময়িক ভারতীয় সমাজকে সমস্তরকম দুর্দশা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে থাকাকালীন ব্রিটিশ শোষণ ও দমন প্রত্যক্ষ করেন নিবেদিতা। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভারতীয় জনগণের দুর্দশার মুক্তি ঘটতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।[১]

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে তাঁর নিজস্ব পথ অনুসরণে কোনো বাধা সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু ১৯০২ সালের ১৪ জুলাই স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের মতপার্থক্য বেড়ে যায়। যেহেতু মিশন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলতে চায় নিবেদিতার পক্ষে মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।[২]

প্রশ্ন ওঠে, তাঁর সময়ে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল নিবেদিতা কোনোভাবে তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন কী? কিছু লেখক এই মত খণ্ডন করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে নিবেদিতা বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য কিছু চিন্তাবিদ এই আন্দোলনে নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দেন।

ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য লেখেন, তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে কখনই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। নিজেকে আড়ালে রেখে তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে এসে যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন নি কিন্তু পরোক্ষভাবে যুব সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩]

কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যে বিবরণ দেন তাতে কোনো সংশয়ই থাকে না যে নিদেনপক্ষে এক সংকটের মুহূর্তে সিস্টার নিবেদিতা গোপন বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ লেখেন, নিবেদিতা মনে করতেন যে, শ্রী অরবিন্দ একজন শক্তির উপাসক। তাঁরই মতো বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, এক মহারাজার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় নিবেদিতা মহারাজাকে গোপন বিপ্লব সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নিবেদিতা মহারাজাকে বলেন যে তিনি শ্রী অরবিন্দের মাধ্যমে নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন।[৪]

শ্রী অরবিন্দ অন্যত্র আবার লেখেন যে তিনি অনুগতদের মাধ্যমে বাংলায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু করার পর পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে আসেন। তিনি দেখেন যে বাংলাদেশে ছোট ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করছে। তিনি এই গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তিনি বাংলায় ব্যারিস্টার পি মিত্রর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন নিবেদিতা। শ্রী অরবিন্দ গণ-আন্দোলনের অন্যতম নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল কেবলমাত্র

গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে তিনি মাঝে মাঝে সময় করে নিবেদিতার সঙ্গে বাগবাজারে দেখা করতে যেতেন।[৫]

একইভাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, বাংলাদেশে বৈপ্লবিক দল স্থাপনের সময় থেকে স্বামীজির শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রশাসনিক কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন।[৬]

এই আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে ইতিহাসের এক পর্যায়ে নিবেদিতা প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করেন সাধু রঙ্গরাজন। তিনি বলেন যে, ১৯০২ সালের ২০ অক্টোবর নিবেদিতা বরোদা পৌঁছান ও শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধর্ম বা বিবেকানন্দর দর্শন তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল না। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল বাংলার রাজনৈতিক ওঠাপড়া। বাংলাদেশের জাতীয়তা বাদী ও বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলির কার্যকরী নেতৃত্ব দেওয়ার স্বার্থে নিবেদিতা শ্রী অরবিন্দর কলকাতা পৌঁছনোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।[৭] রঙ্গরাজন-এর কথায়, নিবেদিতার বাসস্থানটি ছিল বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাংবাদিক, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র। নিবেদিতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকেরা তাঁর বাড়িতে প্রত্যেক রবিবার মিলিত হতেন। এই যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী ও অরবিন্দর ছোট ভাই বারীন্দ্র ঘোষ।[৮]

১৯০২ সালে লর্ড কার্জন যখন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার শ্বাসরোধ করতে 'ইউনিভার্সিটি কমিশন' নিয়োগ করেন তখন নিবেদিতা এই পদক্ষেপের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। যখন শ্রী অরবিন্দ পাঁচ সদস্যের বিপ্লবী কমিটি গঠন করেন নিবেদিতা কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনি এই ছাতার নীচে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনকে সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে এই বিপ্লবী কমিটিটি গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিশে যায়। এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী যুবকদের কাছে উৎসাহ ও পরামর্শদানের উৎস হয়ে ওঠেন সিস্টার নিবেদিতা। ১৯০৫ সালে নিবেদিতা বড় বড় সভায় ভাষণ দেন। এরকম একটি সভায় ব্রিটিশ সরকারের বাংলা বিভাগের অবিবেচনামূলক পদক্ষেপের নিন্দা করে বীর বিপ্লবী আনন্দ মোহন বসু যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তা তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

অরবিন্দ, তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৬ সালের ১২ মার্চ থেকে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে যুগান্তর নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। নিবেদিতার বাড়িতেই এ পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার কপির উপরে।

১৯০৭ সালের ২০ জুলাই যখন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কারারুদ্ধ হন নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে আদালতে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর মায়ের যত্ন নেওয়া ও যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁর ওপর ১০ হাজার টাকার যে জরিমানা ধার্য করা হয় তা সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন।

১৯০৭ সালে নিবেদিতা ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সভা সমিতি, ব্রিটিশ সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভারতের বাইরে থেকে বিপ্লবী পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রচার করা ও বাইরের দেশের ভারতীয় বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করা। ১৯০৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা ইল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দত্ত ও নির্বাসিত অন্যান্য বিপ্লবীদের পুনর্বাসনের স্বার্থে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে একটি বাড়ি ক্রয় করা যাতে এই সমস্ত বিপ্লবীদের বাসের ব্যবস্থা করা যায় এবং তাঁরা তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ মুক্ত হন। এই মুক্তি উপলক্ষ্যে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ে উৎসব পালন করেন। কিন্তু কর্মযোগিন পত্রিকায় তাঁর লেখার জন্য অরবিন্দ ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম ও কর্মযোগিন পত্রিকা দুটির দায়িত্বভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে অরবিন্দ ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল চন্দননগরে দেশত্যাগী হন।

১৯০৭ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে তিনি দমদমেই থাকুন বা বাগবাজারেই থাকুন নিবেদিতার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল পলায়নপর বিপ্লবীদের খাদ্য, অর্থ ও মানচিত্র সরবরাহের কেন্দ্রস্থল। মুরারিপুকুর রোড গবেষণাগারে বোমা তৈরির সঙ্গে নিবেদিতার নাম জড়িয়ে পড়ে। তিনি বারীন্দ্র ঘোষের সহযোগীদের ক্রমাগত সাহায্য করতে থাকেন।[৯]

উপরের আলোচনার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বিপ্লবীদের পরামর্শদাত্রী, উৎসাহদাত্রী ও সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে নিবেদিতা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে ঃ নিবেদিতা কী একজন সন্ত্রাসবাদী ছিলেন? প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা অনেক পরিশ্রম করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।[১০] এ প্রসঙ্গে বিপ্লব রঞ্জন ঘোষ বলেন যে, নিবেদিতা নিশ্চিতভাবেই সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। তিনি বিপ্লবে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন বলে তাঁকে সন্ত্রাসবাদী মনে করার কোনো কারণ নেই। অরবিন্দ ঘোষের মতো বিপ্লবী আন্দোলনের একজন চরমপন্থী নেতার চোখেও সন্ত্রাসবাদ ছিল নিন্দনীয়। তিনি সন্ত্রাসবাদকে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলশ্রুতি বলে মনে করতেন।[১১] ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে দেশের জনগণের কাছে লেখা খোলা চিঠিতে অরবিন্দ বলেন যে, বিচ্ছিন্ন হত্যার ঘটনা দেশের জনগণকে বিপদগ্রস্ত করলেও বিপ্লবীদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, কারণ তাঁরা এই সমস্ত ঘটনা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছেন।[১২]

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শ্রী অরবিন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তাঁর অনুমোদন পায় নি। তিনি বলেন যে গোপন সমিতি তার কর্মসূচীতে সন্ত্রাসবাদকে স্থান করে দেয় নি।[১৩] বিপ্লব রঞ্জন ঘোষের কথায়, যদি শ্রী অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী হন তাহলে নিবেদিতাকেই বা সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বলব না কেন?[১৪]

আত্মপ্রাণা বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদকে গুলিয়ে ফেলেছেন। নিবেদিতা বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা চাইতেন যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করুক। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি হোক তা চাইতেন না।

ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার দিকে নিবেদিতা দিক নির্দেশ করেন। যখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের তীব্র মতপার্থক্যের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন নিবেদিতা ''The Task of the National Movement in India'' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। ১৯০৫ সালে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধের প্রকাশ ঘটে বেনারস কংগ্রেসে, ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে এই বিরোধ বর্তমান থাকে এবং ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এই বিরোধ থেকে সৃষ্টি হয় সংকটের। নিবেদিতা এই বিরোধের দিকে নজর রাখছিলেন এবং উদ্বেগ বোধ করছিলেন। এই রাজনৈতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি সতর্ক করেন এবং এই প্রবণতা টিঁকে থাকার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করেন।

জি কে গোখেলের সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনেককেই অবাক করে, কারণ গোখেল ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা এবং সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানায় তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। অন্যদিকে নিবেদিতা ছিলেন একজন উদগ্র বিপ্লবী। তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতা তাঁকে ১৯০৫-১০ সালের স্বদেশী আন্দোলনের চরম বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দের কাছাকাছি নিয়ে আসে। শ্রী অরবিন্দ গোখেলকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন এবং সরকারের চর হিসাবে গণ্য করতেন।[১৫]

এই পরিস্থিতিতে একজন ধাঁধায় পড়ে যান যখন দেখেন যে নিবেদিতা একদিকে বিপ্লবী শ্রী অরবন্দের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন করছেন আবার অন্যদিকে নরমপন্থী গোখেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলছেন।

ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে এক দৃঢ় যোদ্ধা ছিলেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সমস্ত জাতীয় শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এর ফলে কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর বিভেদ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলাতেই তিনি প্রবলভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের প্রকৃত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে তার দৃঢ় ঐক্য। এই ঐক্যই বিদেশী শাসকদের বিভাজনের নীতির মাধ্যমে শাসনের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করবে।

গোখেল ও নিবেদিতার কর্মপন্থার পার্থক্য স্পষ্টতই ধরা পড়ে। নিবেদিতা ছিলেন বিপ্লবী আর গোখেল ছিলেন একজন নমনীয় চিন্তাবিদ। নিবেদিতা ও গোখেল সমস্ত বিষয়ে, এমনকি মৌলিক বিষয়ে একমত না হলেও গোখেল নমনীয় পথে যে কাজগুলো করতেন তা নিবেদিতার প্রশংসা পেত। নিবেদিতা গোখেলের কাজকর্মের মর্যাদা দিলেও তিনি যে বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করতেন তার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বঙ্গ বিভাগ রোধ করার লক্ষ্যে যে দুটি অস্ত্র বাংলার নেতৃত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তা হচ্ছে স্বদেশী ও বয়কট। নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে এই দুটি অস্ত্র প্রয়োগের পক্ষে দাঁড়ান। কিন্তু গোখেল

বয়কটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কারণ তাঁর মতে বয়কটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় প্রতিহিংসাপরায়ণতা। অন্যদিকে নিবেদিতার মতে, বয়কটের মধ্যে দিয়ে জনগণের আত্মত্যাগের মহত্বের প্রকাশ ঘটেছিল।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেনারস কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বয়কটকে কেন্দ্র করেই তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

বেনারস কংগ্রেসের পর ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে তিলক, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা একটি গোষ্ঠী গঠন করে। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান দূরত্ব নিবেদিতাকে বিচলিত করে। তিনি নেতাদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন কংগ্রেসের ঐক্য বিনষ্ট না করেন।[১৬]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই মত ব্যক্ত করেন যে নিবেদিতা ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী, যদিও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল বৈপ্লবিক ও সুনির্দিষ্ট। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি দলতন্ত্র ও উপদলীয় কোন্দল মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতার উপর আস্থা রাখতেন।[১৭]

নিবেদিতা ভারতবর্ষে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। যার ফলে তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি ভারতবর্ষে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।

নিবেদিতার কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তাঁর মতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই দুটির মধ্যে তিনি কোনো বিরোধ খুঁজে পান নি।

আলিপুরে বন্দীদশার পর অরবিন্দ ঘোষ আর যোদ্ধা নন, এক যোগীতে পরিণত হন।[১৮] যুগান্তর পত্রিকা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে এর একটি দিক হিসাবে গণ্য করে।[১৯]

নিবেদিতা বলেন যে এই ধারণাই জনগণের দাবীতে রূপান্তরিত হবে।[২০]

তিনি এই বক্তব্য রাখেন যে, যে মানুষ নিজেকে দুর্বল মনে করে আঘাত করে না সে পাপী। আর যে মানুষ ভীতির বশবর্তী হয়ে আক্রমণ করে না সে ভীতু।[২১]

নিবেদিতা হিংসা সম্পর্কিত এই ধারণা ভীত সন্ত্রস্ত যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। একথা বলতে বাধা নেই যে তাঁর মতামত তাঁর বন্ধুস্থানীয় অনেককেই আহত করে।

নিবেদিতা মনে করতেন ভারতবর্ষের জাগরণ শুধু রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ জাগরণ হবে পূর্ণ জাগরণ। সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রই হবে এ জাগরণের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যসূত্র

1.'Sister Nivedita', Wikipedia, the free encyclopedia. 2. Sadhu Rangarajan, 'Sister Nivedita, Dedicated Daughter of Mother India', Arise Bharat. (Internet) 3. Biplab Ranjan Ghosh, *Sister Nivedita and The Indian Renaissance*, Progressive Publishers, Kolkata, 2013, p.13. 4. ibid., p. 16 5. ibid. 6. ibid., pp.16-7. 7. Sadhu Rangarajan, op. cit. 8. ibid. 9. Reymond Lizelle, *The Dedicated, A Biography of Nivedita*, John Day Company, New york, 1953, p. 336. 10. Biplab Ranjan Ghosh, op. cit., p. 13. 11. ibid. 12. ibid. 13. ibid., p. 14. 14. ibid. 15. ibid., p. 57. 16. ibid., p. 63. 17. ibid. 18. Reymond Lizelle, op. cit., p. 350. 19. ibid., p. 325. 20. ibid. 21. ibid., p.327.

উমা

নবকলেবরে

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান

'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান' অনেক দিন নিঃশেষিত। দুই খণ্ডের

'বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান'

পরিমার্জিত হয়ে একখণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে

স্মার্ট ক্লাস ও 'আনস্মার্ট' ভাবনা'

সুদেষ্ণা ঘোষ

বহুদিনের আশ্রয় পথের ধারের সবুজ বটগাছটির মায়া ত্যাগ করে করে হলুদ পাতাটি হেমন্তের মৃদু বাতাসে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে নীচে নামতে লাগল। দুপুরের রোদ্দুরে চারিদিক ঝলমল করছিল। বাতাসে শীতের একটা হাল্কা আমেজ। বারান্দায় সে আমেজ উপভোগ করছি, হঠাৎ মনে পড়ল, আর তো কটা দিন, তার পরেই পুজোর ছুটি শেষ। সেই ফিরে যেতে হবে স্কুলের বদ্ধ স্টাফরুমে!

এই রে, বদ্ধ ক্লাসরুম বলে ফেললাম নাকি! না না... স্মার্ট বললে আজকালের ক্লাসরুমের ঠিক চিত্রটা চোখের সামনে ভাসবে। অবশ্য যাঁরা শিক্ষাজগৎ সম্বন্ধে অবগত নন তাঁদের জন্য একটু বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন হতে পারে। স্মার্ট কথাটির আভিধানিক অর্থ কাজকর্মে 'তীক্ষ্ণধী', 'চটপটে', 'বুদ্ধিমান', 'ফিটফাট' বা 'দক্ষ' হলেও ক্লাসরুমের সঙ্গে কথাটি ব্যবহৃত হলে চোখের সামনে কেতাদুরস্ত ঝাঁ চকচকে একটা ছবি ভেসে ওঠে। যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম মজুত। কী সেই ব্যবস্থা বা সরঞ্জাম? এইসব স্মার্ট ক্লাসে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়বে কালো বা পরবর্তীকালের সবুজ বোর্ডের বদলে সাদা বোর্ড। সেটা কী বোঝার জন্য যখন এদিক-ওদিক চাইবেন, তখন বোর্ডের দিকে তাক করা ক্যামেরা, থুড়ি প্রজেক্টর দেখতে পাবেন। সেই ঘরের কোথাও ওই বোর্ডকে চালনা করার বিভিন্ন সরঞ্জাম– কম্পিউটার, সিপিইউ, কি-বোর্ড, মাউস, ইউ পি এস এবং জাদুকাঠির মতো একটি ছোট যন্ত্র, নাম 'স্টাইলাস্' রাখা আছে। জাদুকাঠি বললাম, কারণ এর সাহায্যে সারা পৃথিবীর চিত্র আপনি ক্লাসের চার দেয়ালের মধ্যে এনে ফেলতে পারবেন। অবশ্য এর জন্য নেপথ্যে অনেক কাজ করতে হয়। কখনো কখনো শিক্ষিকা নিজেই বই এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে তথ্য জোগাড় করে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন। তাতে সঙ্গীত, শব্দ, চলন্ত ছবি, সবই থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম স্থির বা চলন্ত ছোট ছোট চিত্র তৈরি করা থাকে, তাতে প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে খেলা করা, নিজে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সাজানো, নিজের কিছু তথ্য ভরে দেওয়া, সবই করা যায়। এগুলি পাঠ্যক্রম এবং ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণী অনুসারে তৈরি করে কোনো বড় কোম্পানি। তারপর স্কুলকে এই পুরো জিনিসটি (সফট্অয়্যার) বিক্রি করা হয়। বলা বাহুল্য এসব কিছুর খরচ সাধারণ পাঠশালার নাগালের বাইরে।

তাছাড়াও আছে শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার। সেই দায়িত্বও নেন সেই কোম্পানি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়ে প্রায়ই দেখেছি ক্লাসে কী কী অসুবিধা হতে পারে সে সম্বন্ধে ওঁরা অবগত নন। অনেক সময়ে আমাদের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর ওঁরা দিতে পারেন না।

ভূগোলের শিক্ষিকা হওয়ার দরুণ পরে দেখেছি যে, এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে কিছু দুরূহ ধারণা, যেমন– পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস, প্লেট টেকনিক্স তত্ত্ব, জিওমরফোলজির অন্তর্ভুক্ত ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন রূপের উদ্ভব, মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি এবং তার বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণ ও প্রমাণ ইত্যাদি সব বোঝানো অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য মনে রাখাও সহজ, কারণ কোনো কিছু চোখে দেখলে তা চিত্তাকর্ষক তো হয়ই, মনেও গেঁথে যায় কিছুটা। বলাই বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণবৃদ্ধি করার এটি একটি সহজ উপায়। আগেকার দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকার বলার ঢঙ, পড়ানোর ক্ষমতা, জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদির ওপরে জোর ছিল বেশি। এখন ওদিকে কিছু খামতি থাকলেও তা এসব স্মার্ট ক্লাসের নতুন প্রযুক্তি দিয়ে পূরণ করা (বা ঢেকে ফেলা) সহজেই সম্ভব। ভালো শিক্ষক/শিক্ষিকার সংজ্ঞা বদলেছে।

এছাড়াও একটি সফট্অয়্যার আছে যা দিয়ে ওই সাদা বোর্ডে লেখা যায়। যন্ত্র আবার সেই জাদুকাঠি অর্থাৎ স্টাইলাস। শুধু লেখা নয়, আঁকাও যায়। গোল, ত্রিভুজ, চৌকো, সরল রেখা, বক্র রেখা- আরো কত কি! এবং বিভিন্ন রঙে। অঙ্কের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বেশ কিছু উপাদান আছে যা দিয়ে বোর্ডে আঁকার কাজ অনেক সহজ

ও সঠিকভাবে করা সম্ভব। এছাড়া শিক্ষিকা সেদিন যা শেখালেন, তা সাধারণ চকের বোর্ডে মুছে দেওয়া হয় কিন্তু স্মার্ট বোর্ডে তা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

প্রথমের দিকে প্রশিক্ষণের পরে শিক্ষিকারা এই সফট্অয়্যারটি নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক বয়স্ক শিক্ষিকাদের শিশুসুলভ আচরণ এবং উদ্যম সত্যিই আনন্দদায়ক এবং প্রশংসনীয়।

নতুন কিছু শুরু হলে মানুষের আচরণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়– অতি উৎসাহী, মধ্যপন্থী এবং নিরুৎসাহী। প্রথম ভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের অত্যধিক বেশি আগ্রহের সামনে অন্যদের ম্রিয়মাণ দেখায়। এঁরা প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে এগোন এবং নতুন প্রযুক্তিকে প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কিছু লোক উপরতলার মানুষদের খুশি করতে এরকম করে থাকেন।

এঁদের ঠিক উল্টো হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা পুরাতনপন্থী। মনে করেন সবই জানা হয়ে গেছে। এর আগে এসব ছাড়াই পড়াশোনা চলেছে। নতুন করে শেখার বা জানার ইচ্ছা বা উদ্যম এঁদের নেই। এঁরা বাধ্য হয়েই সবকিছু করেন কারণ ভয়, না পারলে চাকরি নিয়ে যদি টানাটানি হয়? এঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

বেশিরভাগই মধ্যপন্থী। করতে হবে, তাই শিখে নেওয়াই ভালো ভাব। কিছুটা চেষ্টাও আছে, তার সঙ্গে ছিটেফোঁটা আগ্রহ। শিখে নিয়ে দেখতে চান, ভবিষ্যতে কী হয়। আমি নিজেকে এই দলেই ফেলব। কারণ প্রশ্ন ছাড়া কোনো কিছুই মেনে নেওয়া সমীচীন মনে করি না। শেখা হলে ছাত্রীদের কতটা কাজে লাগবে, শিক্ষাপ্রদানের জন্য, কতটা সুবিধা হবে এসব নিয়ে ভেবেছিলাম শুরুতেই। পড়ানোর সময় এই নতুন প্রযুক্তির ফল অনেক বেশি টের পেলাম।

সাধারণ অসুবিধার মধ্যে আধুনিক সরঞ্জামের হঠাৎ কাজ না করাটাই ধরা যাক। যন্ত্র তো যন্ত্রই হয়। মানুষের মতো নয় যে জ্বর-জ্বালা নিয়েও কাজ করবে। আধুনিক এসব দামি যন্ত্রপাতির পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। আপনার সব পরিশ্রম, ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনা পণ্ড করে সেদিন আর চলবে না। এরকম পরিস্থিতিতে একবার পড়েছিলাম নবম শ্রেণীতে ভূগোলের একটি অত্যন্ত জরুরি এবং আকর্ষণীয় বিষয়, মৌসুমীবায়ুর চলাচল সম্বন্ধে কিছু বোঝাতে গিয়ে। পড়ানোর জন্য কিছুদিন ধরে বই এবং ইন্টারনেটের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পড়ানোর ধারাবাহিকতা, ছাত্রীদের বোঝার ক্ষমতা, ছবির বা মানচিত্রের স্পষ্টতা মাথায় রেখে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছিলাম।

মন মেজাজ ভালো। ছাত্রীদের নিশ্চয় জলের মতো সোজা লাগবে। ক্লাসে ঢুকে কম্পিউটার চালাতে গিয়ে বিভ্রাট। কিছুতেই তার ঘুম ভাঙানো গেল না। ডাকা হল 'রিসোর্স রুম' থেকে 'এক্সপার্ট'-কে। যে কোম্পানি সফট্অয়্যার দিয়েছে, তাদের একজন কর্মী স্কুলের একতলার একটি ঘরে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকেন সারাদিন। এই কম্পিউটারটি 'সারভার' বা 'মা' কম্পিউটার না চললে সবকিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি এলেন। চেষ্টা করতে গিয়ে ৪০ মিনিটের ক্লাসের ১০ মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। কিছু করা যাবে না; মেশিনের গোলমাল। 'এক্সপার্ট' দুঃখ প্রকাশ করে খাতায় 'কমপ্লেন্ট' লিখে নিয়ে গেলেন। আরও ৫ মিনিট গেল। আমি তখন ঘর্মাক্ত অবস্থায় সেই পুরনো পন্থা অবলম্বন করে চক-ডাস্টার হাতে নিলাম। কি আশ্চর্য! পৃথিবীর মানচিত্র, যা একদিন অবলীলাক্রমে হাতে এঁকে ফেলতে পারতাম, তা আঁকতে আজ হাত কাঁপল। ঠিকমতো হল না। মৌসুমী বায়ুর আসা যাওয়া কোনোক্রমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম সেদিন। মানুষ অভ্যাসের দাস। কেতাদুরস্ত হতে গিয়ে প্রায় ১৮ বছর ধরে রপ্ত করা একটা দক্ষতা এক বছরে হারিয়ে গেল! একটা বড় ধাক্কা খেলাম সেদিন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এটা তো গেল যান্ত্রিক গোলযোগের কথা। এবারে সবকিছুই যদি ঠিকমতো চলে তাহলে কি কিছু বলার থাকতে পারে? পারে। সেটা অন্য একদিনের ঘটনা। নবম শ্রেণীতে ভূগোল পড়াতে গিয়ে। সেদিন ভারতের নদী এবং নদীর কার্যের ফলে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপ বোঝাচ্ছিলাম। ভারতের মানচিত্রে আমি তখন পাঞ্জাবে। ছাত্রীদের টেবিলে খোলা ভূগোলের বই এবং অ্যাটলাস, সামনে স্মার্ট ক্লাসের বোর্ডে পাওয়ার পয়েন্ট। দোয়াব বোঝানো চলছে। বোর্ডে একটি সাদা পাতা খুলে এঁকে বোঝাচ্ছি। আসল চিত্র বোঝাতে পাওয়ার পয়েন্টে ছবি দেখাচ্ছি। জাদুকাঠির ব্যবহারে রপ্ত হয়ে গেছি। নীল রঙে দুটি নদী এঁকে দিয়ে, তার মধ্যবর্তী জমিটি খয়েরি রঙে রাঙিয়ে দিলাম। বললাম, দুটি সমকেন্দ্রাভিমুখ নদীর মধ্যবর্তী উর্বর জমিকে দোয়াব বলে, যেমন দেখা যায় পাঞ্জাবের নদীগুলির মধ্যে। সহজ

কথা। এঁকে দেখিয়েছি। ছবি দেখিয়েছি। মানচিত্রে দেখিয়েছি ভুল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষিকারা শুধুই পড়াতে পারেন। বোঝাতে চেষ্টা করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের মনের ভেতরে যেতে পারেন না। পরীক্ষার খাতায় ছাত্রছাত্রীরা কী লিখবে বোঝা প্রায় অসম্ভব। 'দোয়াব কাকে বলে' প্রশ্নের উত্তরে যখন দেখলাম 'দুটি নীল রেখাকে দোয়াব বলে' তখন ভালো পড়ানোর 'খোয়াব'টি নিমেষে অদৃশ্য হল। খাদের ধারে দাঁড়ানো, না ফিরতে পারা মানুষের যা পরিস্থিতি হয়, আমারও তাই হল। হতভম্ব ভাবটি কখন হতাশায় পরিণত হয়েছিল নিজেই জানি না। বুঝলাম জমি উর্বর না হলে ভালো ফসল হয় না। তা সে যতই আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ হোক না কেন।

যাক এসব কথা। নতুন প্রযুক্তি রমরম করে চলছে। আর কেনই বা হবে না? এটা তো মানতেই হবে যে চকের ধুলো ঘাঁটতে হচ্ছে না শিক্ষক-শিক্ষিকাদের! অঙ্কের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাই খুব ব্যবহার করেন। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ক্লাসে চালিয়ে রেখে দেন, ছাত্রীরা সিনেমা দেখার মতো মডিউল দেখে, শিক্ষিকা খাতা দেখেন, পড়াশোনা আপনি চলে। কম্পিউটারে 'রেকর্ড' হয় অমুক শিক্ষিকা সবচেয়ে বেশি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। আমাদের মতো পুরাতনপন্থী শিক্ষিকাদের আরো উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলা হয়।

এছাড়া এই স্মার্ট বোর্ডের দৌলতে গ্রীষ্মকালে শিক্ষিকাদের এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে টেঁকাই দুষ্কর আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়। হয়ত তার জন্য ক্লাসরুমে একদিন 'এ সি' লাগানো হবে। আমরা আরো আধুনিক হব। স্কুলের আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখতে আমরা পৃথিবীর আবহাওয়া আরও গরম করে তুলব। এবং 'এ সি' চালিয়েই স্মার্ট বোর্ডের সাহায্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলি ছাত্রছাত্রীদের বোঝাব।

হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে মুখে লাগল। চমকে উঠে দেখলাম, কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। পড়ন্ত রোদের লালচে আভায় আকাশ দোল খেলায় মজেছে। এত সুন্দর সূর্যাস্ত! আজকাল এও হয়ত কম্পিউটারের সাহায্যে ক্লাসে দেখানো যাবে। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ পাওয়া যাবে কি? বাতাসে মন আনমনা হবে কি? মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন এসে ভীড় করে... এই আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার মান কি সত্যিই বেড়েছে?

উমা

জলাভূমি কাকে বলে?

সুবীর ঘোষ

১৯৮৭ সাল থেকে ২০১৫। প্রায় তিন দশক। এই তিন দশক সময় ধরে জলাভূমি কাকে বলা হবে এ নিয়ে আমরা ধস্তাধস্তি করে গেলাম। আন্তর্জাতিক স্তরে জলাভূমি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আয়তনে বড় এমন জলাভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের রাজ্যে নানান আলোচনা চক্রে রামসার ব্যুরো প্রদত্ত সংজ্ঞা বারেবারে উঠে এসেছে ঠিকই— কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সীমিত স্বার্থের ঊর্দ্ধে গিয়ে রামসার ব্যুরো প্রদত্ত সংজ্ঞার প্রয়োগ করতে পারি নি বহু জায়গায়। এ কথা সত্যি যে পৃথিবীর বহু দেশে উন্নয়নের স্বার্থে জলাভূমি সংকোচন ঘটেছে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বা পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে শিথিলতার কারণে জলাভূমি ভরাট হয়ে গেছে এমন উদাহরণ আমাদের দেশের মতো আর কোথাও আছে কিনা জানি না। তত্ত্বগতভাবে বিষয়টি খুব সহজ নয়। UNESCO Chair, C.D.K Cook-এর মতো বিজ্ঞানীও (যাঁর লেখা জলজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত বহু গবেষণামূলক বই আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত) খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, সত্যিই জলাভূমি সনাক্ত করা যথেষ্ট শক্ত। কারণ এর সঙ্গে বহু বিষয় যুক্ত যা কেবল বিজ্ঞান দিয়ে সবসময় ব্যাখ্যা করা যাবে না বা যার সঙ্গে বহু স্বার্থ জড়িয়ে আছে — প্রয়োজনে যা বিজ্ঞানের ধার ধারে না। বলা ভালো স্বার্থ বিজ্ঞানের পরোয়া করে না।

'জলাভূমি' (wetlands) পৃথিবীর যে কোনো বাস্তুরীতির মধ্যে জটিল। এই বাস্তুতন্ত্রের মূল উপাদানগুলির মধ্যে যে মিথোষ্ক্রিয়া ঘটে তা অত্যন্ত dynamic আর ঋতু ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। 'wetlands' সম্পর্কে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার কনভেনশনের সংজ্ঞার তর্জমা করে বলা বলা যায় wetlands হল স্থায়ী বা অস্থায়ী, কৃত্রিম বা

প্রাকৃতিক অগভীর স্রোতযুক্ত বা স্রোতবিহীন জলাশয় যার জল মিঠে (fresh water) বা মৃদু লবণাক্ত (brackish) বা তীব্র লবণাক্ত (Saline) বা সামুদ্রিক যেখানে মরা জোয়ারে (low tide) জলস্তম্ভের সর্বাধিক উচ্চতা কোনোমতেই ছয় মিটারের (প্রায় ২০ ফুটের) বেশি হবে না। বিভিন্ন দেশের জলাভূমির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিজ্ঞানীরা wetlands-এর সংজ্ঞার অনেক পরিবর্তন করেছেন।

জলাভূমির সম্ভবত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল তার সম্পদ— তার জীববৈচিত্র্য। জলাভূমি জল ও মাটির মিলনস্থল যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে জলাভূমি নির্ভর মানুষদের হাজার হাজার বছরের পরম্পরাগত জ্ঞান আর প্রজ্ঞা। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জনৈক বিজ্ঞানী বিধান দিলেন জলাভূমিতে জলজ গাছের ভূমিকা গৌণ। ব্যাপারটা এরকম যে এরা অবাঞ্ছিত। তা হলে তাঁদের কাছে কাঙ্খিত কোনটা? নিশ্চয়ই টন টন মাছ। কিন্তু একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মাছ চাষী বলছেন গাছ-মাছ একসঙ্গে থাকলে মাছের বাড় (বৃদ্ধি) ভাল হয়। ক্ষতি তো হয়-ই না। তাহলে কি বিজ্ঞানী সঠিক বলছেন না? এখানেই গ্যাপ। এই সমস্ত বিজ্ঞানীর অস্ত্র বা পুঁজি পুঁথিগত বিদ্যা। আর ঐ মাছ-চাষীরা? তাঁদের কথার ভিত্তি কিন্তু তাঁদের হাতে-কলমে শেখা ট্র্যাডিশনাল নলেজ-এর ভাণ্ডার। কার জোর বেশি পাঠকরাই বিচার করুন। পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর মিশে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানী ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ উপলব্ধি করেছেন প্রথাগত জ্ঞানের গুরুত্ব কতটা! তাঁর কথায় ঐ অঞ্চলের মাছ চাষীরা বর্ণ-গন্ধ-আস্বাদ দিয়ে জলকে বিচার করেন। বিচার করেন সেই জল মাছের জন্য কতটা উপযোগী। যাঁরা এতটা পারেন তাঁদের চোখে জলাভূমি কী আমরা কি জানার চেষ্টা করেছি? জল, মাটি, বাতাস আর সূর্যালোক এই চারটি উপাদান থাকলেই সেখানে জলজ জীব থাকবে এমনটা নয়। এই চার উপাদানের মধ্যে সঠিক মিথোষ্ক্রিয়া ঘটায় জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা। পদ্ম আর স্থলপদ্ম দুটোই ফুল। স্থলপদ্মের মাটি জলে ভিজিয়ে রাখলে কী সেখানে জলপদ্ম জন্মাবে? জন্মাবে না তার কারণ সময়। দীর্ঘ সময় ধরে জল-মাটির আন্তঃবিক্রিয়ার ফলে একসময় তা জলজ উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। জলাভূমির মাটি 'Hydric Soil'। সেখানে কেবল জলজ উদ্ভিদই জন্মাবে। বেগুন বা পেঁপে গাছ হবে না। এমন কোনো গাছ কখনোই থাকবে না যারা জল সম্পৃক্ত পরিবেশ সহ্য করতে পারে না। এখানে একটা ফাঁক থাকছে। ধরা যাক মালদা-র আমবাগান বানের জলে ভেসে গেল। দু'মাসে জল নামল না। তাহলে কী ধরে নেব আম জলজ উদ্ভিদ! বা এমন অনেক পুকুর গ্রামে ঘুরলে দেখা মেলে যেখানে বছরের অন্তত বর্ষাকালটায় পুকুরপাড়ের নারকেল বা তালগাছের গোড়া জলে পুরো ডুবে থাকে। তাহলে তাল-নারকেল গাছও কী জলজ? না। সেটা অবশ্যই নয়। ব্যাপারটা এ ধরনের কাষ্ঠল উদ্ভিদ জলে কিছুটা সময় ডুবে থাকলে 'Stress period' অতিক্রম করে। ভাল করে দেখলে দেখা যাবে হয়ত পাতাও জন্মায়। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। আমরা যদি উদ্ভিদবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জলাভূমি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে এমন প্রচুর জায়গা আছে যেখানে মাটিতে সপ্তাহ দুয়েক বা তার বেশী জল দাঁড়িয়ে থাকে আর পুরো বর্ষাকালটায় জলে ভেজা থাকে কিন্তু সেখানেই গরম বা শীতকালে গম চাষ হচ্ছে বা পেঁপে বেগুনের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। তাহলে এগুলোকে আমরা কী বলব! জলজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার প্রবণতাটা এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জল নেমে গেলে যেখানে চাষাবাদ হতে পারে কিন্তু বর্ষায় স্বাভাবিকভাবে জলে ভরে গেলে জলাভূমির ক্ষেত্রে সেখানে জলজ উদ্ভিদই জন্মাবে।

মাঠের পর মাঠ ধানক্ষেত। শীতকালে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। গ্রীষ্মে কোথাও বা ফুটবল। বর্ষায় ধান চাষ হচ্ছে। ধান চাষের সময় ঐ সব জায়গায় এমন কিছু আগাছা বা আমাছা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মাচ্ছে যা জলাধারগুলোতে জন্মায় না। এখানেই প্রশ্ন ইডেন গার্ডেনকে জলজ করে রাখলে কী সেখানে এসব জন্মাবে? তাহলে শুধু জলটাই বা মাটিটাই প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন জল ও মাটির মধ্যে এমন মিথোষ্ক্রিয়ার যার ফলশ্রুতি আগাছা বা আমাছার জন্ম। এটা কেবল জলজ বাস্তুতন্ত্রেই সম্ভব। তাই wetlands ভাবতে গেলে জলজ বাস্তুরীতিকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

কেউ কেউ ধানক্ষেতকে জলাভূমির অন্তর্গত করতে বা ভাবতে নারাজ। কিন্তু ধানক্ষেতের মাটি আর বেলতলার মাটি কী এক? 'স্বর্ণ', 'IR-8' আরও কিছু ধান চাষ করতে জল কম লাগে। এ ক্ষেত্রে ধানক্ষেত জলমগ্ন না থাকলেও হয়। এটা ভাবলে তো ধানক্ষেতের ভৌত রাসায়নিক

পরিবর্তন হবে না। জাপানে Natural wetlands-এর বিকল্প হিসাবে ধানক্ষেতের 'Service' নেওয়া হচ্ছে। ধানক্ষেতও একটা 'wetlands' যা যা কাজ করে যেমন— ভৌম জলস্তর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকা অবক্ষয় রোধ, ধ্বস নামা প্রতিরোধ,কার্বন সঞ্চয়, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সবই করতে সক্ষম। নেট ঘাঁটলে দেখা যাবে জাপানে ধানক্ষেত ও তার চারপাশে হাজার পাঁচেক প্রজাতি এক বিপুল জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার গঠন করেছে। ওখানে ধানক্ষেত থেকে যে 'Service' পাওয়া যায় তার পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই পরিমাণ আর্থিকভাবে প্রায় ৭২.৮ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। এক দেশ তাদের ধানক্ষেতের ইকোসিস্টেম সার্ভিস কাজে লাগাচ্ছে আর আমরা হিসাব করছি কত করে Saff বিক্রি হবে! এটা শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক। এটা 'আয়োনাইজেশান'-এর যুগ। নিদেনপক্ষে শিল্পের তকমায় ইকোসিস্টেমের ভোল পাল্টে দেওয়া যাবে। সবুরে মেওয়া ফলবে।

জলাভূমি বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে জলমগ্ন জমি যেখানে কখনও দেখা মিলবে শাপলা-শালুকের দল বা নল-হোগলার জঙ্গল, মাছ-আমাছা-ব্যাঙ-ব্যাঙাচিরা হেসে খেলে ঘুরে বেড়াবে--- যা তাদের জীবনের ভরসা জোগাবে। জোগাবে বাঁচার রসদ--- পোকামাকড়, সাপখোপ, হাঁসা-হাঁসি, চকাচকির দল মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। আর এসব হতে গেলে 'technical precision'গুলো থাকতেই হবে। জলজ উদ্ভিদ যে জলাভূমির ফুসফুস-একাধারে বৃক্ক। জলের গাছের গুরুত্ব না দিলে জলাভূমির বাস্তুরীতি বিপন্ন হবে। কমবে জীববৈচিত্র্য। আমাদের পূজা-পার্বণ-সংস্কার সর্বত্র জলাভূমির একটা গুরুত্ব আছে। মেয়েরা পুণ্যিপুকুর ব্রত করেন। আবার কেউ কেউ পুকুরের পর পুকুর ভরাট করে হয়ত কোনো বৃহত্তর স্বার্থে।

সবশেষে র‍্যামসার কনভেনশন ব্যুরো তাঁদের 'The Ramsar Convention on Wetlands'-এ ধানক্ষেত সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম তাঁদের জন্য যাঁরা ধানক্ষেতকে কীভাবে 'Wetlands'-এর খপ্পর থেকে বার করে আনা যায় ভাবছেন।

'As defined by the convention, wetlands include a wide variety of habitats such as marshes, peatlands, flood-plains, rivers and lakes and coastal areas, **but also** coral reefs and other marine areas no deeper than six metres at low tide, as well as **man-made**. **Wetlands such as rice fields** and reservoirs. Wetlands are very important for the ecological functions which they perform, as well as for their rich flora and fanna. They also constitute a resource of great economic, cutural, scientific, and recreational value to human life. Wetlands and people are ultimately interdependent.' (Ramsar, Iran, 1971)

আমাদের সচেতনতার স্তর বাড়ানোর প্রয়োজন। শুধু তথ্য দিয়ে নয়--- হাতে কলমে জলাভূমির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য শিক্ষণের প্রয়োজন। জলাভূমি ভরাটের ফন্দি-ফিকিরের জন্য 'Wetlands' definition-কে শিখণ্ডি খাড়া করে বা কিছু অপযুক্তির অবতারণা করলে ঠকতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। যাঁরা সচেতনভাবে জলাভূমি বাঁচানোর লড়াই করছেন তাঁদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে কী বিজ্ঞান পাল্টাবে? বাঁচবে মানুষ। বৃহত্তর স্বার্থ কোনটা সেটা বিচার করার দায়িত্ব আমাদেরই।

উমা

বইমেলায়
উৎস মানুষ-এর
নতুন বই

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের
চারপাশের পরিবেশ বিষয়ক বই

গুমোট ভাঙার গান

সুস্থায়ী কৃষির এক খোঁজ

সম্পদরঞ্জন পাত্র

রাসায়নিক কৃষির যথেচ্ছ প্রয়োগে উৎপাদনশীলতার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে এটি এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সহজে আর তা বাড়ানো যাচ্ছে না। এমনকি ঐ উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে আরো বেশি রাসায়নিক দিতে হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে ঘটছে মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ। তাই রাসায়নিক কৃষিব্যবস্থা যে স্ববহনক্ষম নয় এবং অস্থায়ী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে এখন সবথেকে বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে, এমন এক কৃষিব্যবস্থার, যাতে পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকবে অথচ উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে না। এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের দিকে।

কৃষিকাজ শেখবার আগে মানুষ বনেজঙ্গলে ফলমূল সংগ্রহ ও শিকার করে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করত। যাযাবর মানুষের দিন কেটে যেত অনিশ্চিত আহারের খোঁজে। গাছ থেকে বীজ মাটিতে পড়ে তার থেকে নতুন গাছ জন্মায় ও ফুলফল উৎপন্ন করে। পর্যবেক্ষণী মানুষ প্রকৃতির এই শাশ্বত ব্যবস্থার অনুকরণ করে অর্থাৎ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা জমিতে পুঁতে ফসল ফলানোর কৌশল রপ্ত করছিল। যার পোশাকি নাম কৃষি। ফলে তার আহারের জোগান কিছুটা নিশ্চিত হল। বীজ বোনা থেকে ফসল তোলা-- এই সময় পর্যন্ত সে এক জায়গায় আস্তানা গাড়তে বাধ্য হল। থিতু হল। নিজের স্বার্থে ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করা। অর্থাৎ নিজের বাইরেও অন্য কাউকে রক্ষা করার দায় ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শিখল। এরপর ধাপে ধাপে শিখল জঙ্গলের মাটিই ফসল উৎপাদনে সবচেয়ে উপযোগী হলেও তার ছায়া ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই সে জঙ্গল পুড়িয়ে কৃষিজমির পত্তন করল। এতেও সমস্যার সমাধান হল না। পত্তন করা জমিতে প্রথম প্রথম ভাল ফলন হলেও ক্রমশ তা কমতে কমতে একসময় চাষের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। ফলে তা পরিত্যাগ করে আবার জঙ্গল পুড়িয়ে নতুন জমির পত্তন করতে হয়। কৃষিজমির এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতার কারণে তাকে হতে হল বাধ্যতামূলক যাযাবর। পরিত্যক্ত জমিতে পুনরায় জঙ্গল গড়ে উঠত এবং ঐ জঙ্গল বাস্তুতন্ত্রে তার হারিয়ে যাওয়া উৎপাদনশীলতার পুনর্নবীকরণ ঘটত, মানুষ সেখানে পুনরায় কৃষিজমির পত্তন করত।

এইভাবে জঙ্গল থেকে জমি, জমি থেকে জঙ্গল এই চক্রাকার ব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত হল। যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থায়ী সভ্যতার উন্মেষ ঘটানো ছিল অসম্ভব। জনসংখ্যা কম থাকায় জমি পত্তনে জঙ্গল পেতে সমস্যা হয় নি। এইভাবে চলছিল যুগের পর যুগ। কিন্তু যে মানুষ একবার প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে শুরু করেছে তার সমস্যা হবে না, প্রকৃতিশাসিত বিশ্বে তা কখনই হতে পারে না।

মানুষ আগুন-অস্ত্র ও কৃষি করায়ত্ত করেছিল। ফলে খাদ্যসুরক্ষা ও নিরাপত্তাবৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছিল জনসংখ্যা। ফলে মানুষের কাছে অরণ্য সহজলভ্য রইল না। জঙ্গলের দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হল। শুরু হল হানাহানি। নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজতে শুরু হল ভাবনাচিন্তা। মানুষ লক্ষ্য করেছিল, জমির হারিয়ে যাওয়া উৎপাদনশীলতা জঙ্গলবাস্তুতন্ত্রে ক্রমশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু কৃষিবাস্তুতন্ত্রে তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সম্ভবত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, ফসলের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে জমিতে বিশেষ কোনও জিনিস যুক্ত হওয়া জরুরি। কী সেই জিনিস? জঙ্গলবাস্তুতন্ত্রে জীবজন্তু-পশুপাখির মলমূত্র এবং গাছের বর্জ্য জমিতে যুক্ত হয় যা কৃষিবাস্তুতন্ত্রে যুক্ত হয় না। সম্ভবত এই পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ প্রাকৃতিক এই ব্যবস্থার কৃত্রিম প্রয়োগে ব্রতী হয়েছিল। বনজঙ্গল থেকে পচাপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রয়োগ করে মানুষ দেখল, জমির উৎপাদনশীলতা আর কমছে না। সুতরাং জমি পরিবর্তনের আর প্রয়োজন পড়ল না। এইভাবে নিজের অজান্তে মানুষ শিখে ফেলেছিল যুগান্তকারী জৈব কৃষিপদ্ধতি।

যাযাবর মানুষ থিতু হল, উন্মেষ ঘটল স্থায়ী সভ্যতার। এই ব্যবস্থা সমাজজীবনেও আনল পরিবর্তন। আগে নারী-পুরুষ একসঙ্গে শিকার করত কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কাজের ভাগাভাগি হল। বলবান পুরুষ বেছে নিল

শিকার, নারীকে দেওয়া হল পশুমল সংগ্রহের কাজ।

জমির উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে চাই পশুমল, অন্যদিকে পশুর মাংসও মানুষের উপাদেয় খাদ্য। এই দুইয়ের প্রয়োজন মেটাতে শুরু হল পশুপালন। জঙ্গলের গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া হয়ে উঠল গৃহপালিত। ক্রমে মানুষ শিখল পশুদুগ্ধের ব্যবহার। অলসভাবে বসিয়ে না রেখে তাকে দিয়ে নানা কাজ করানো, যেমন লাঙল, গাড়ি ইত্যাদি পশুনির্ভর ব্যবস্থা। ক্রমে পশু হয়ে দাঁড়াল মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কৃষির উপজাত হিসাবে খড়, বিচুলি, ভুষি, খোল পরিণত হল উপাদেয় খাদ্যে। এইভাবে মানুষ সৃষ্টি করল কৃষি, পশুপালন ও জমির একটি ত্রিমাত্রিক সম্বন্ধ। এ যেন অরণ্যবাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ, পশু ও জমির ত্রিমাত্রিক বন্ধনেরই মনুষ্যকৃত নবরূপ।

এই ব্যবস্থা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনারই কৃত্রিম সংস্করণ হওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্ঘাত তৈরি হয় নি, বরং সহাবস্থান ঘটেছে। ফলে কৃষিতে স্ববহনক্ষম এই ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে এসেছে অথচ তার জন্য প্রকৃতির কোনো উপাদানই রিক্ত হয় নি। শুধুমাত্র প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ত্রিমাত্রিক এই মহান ব্যবস্থা যে কী পরিমাণ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রকৃতির আত্মশক্তিতে ভরপুর, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হাজার হাজার বছরের স্থায়িত্ব।

শুধু জমির উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার কৌশলই নয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে আমাদের পূর্বপুরুষরা কৃষির প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছিল। যে পশুশক্তি ব্যবহার করে কঠিন কর্ষণ ও মই দেওয়ার কৌশল, সেচের উদ্ভাবন, সবুজ সার এমন কি শস্য পর্যন্ত। ডাল শস্য চাষের মতো সূক্ষ্ম বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশলও তারা অনায়াসে করায়ত্ত করেছিল। তারা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচন করেছিল নানা ফসল ও তাদের নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর হাজার হাজার জাত। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হল— কৃষি উন্নয়নের প্রতিটি ব্যবস্থাই ছিল প্রাকৃতিক। এইভাবে প্রকৃতির আত্মশক্তির খোঁজ ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষির যে উন্নয়ন ঘটানো হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণভাবে পরিবেশবান্ধব ও স্ববহনক্ষম।

স্বাভাবিক নিয়মে মাটিতে উদ্ভিদখাদ্য তৈরি হলেও তার হার কিন্তু অত্যন্ত কম যা ফসলে ধারাবাহিকভাবে খাদ্যের জোগান অব্যাহত রাখতে অক্ষম সেই কারণে এর পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্ত জৈবচক্রের যা জমিকে পরিপূরক উর্বরতা দিয়ে থাকে। শক্তিশালী জৈবচক্র জমিকে ক্রমশ অধিক উৎপাদনক্ষম আর দুর্বল জৈবচক্র জমিকে ক্রমশ অনুৎপাদক করে তোলে। তাই জমির উৎপাদনশীলতা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে তার ব্যবহারের সাপেক্ষে একটি স্ববহনক্ষম ন্যূনতম জৈবচক্র জারি থাকা আবশ্যিক যা প্রাকৃতিকও হতে পারে অথবা কৃত্রিমও।

উর্বরতাই প্রাণপ্রাচুর্যের কারণ, না প্রাণপ্রাচুর্যই উর্বরতার কারণ, তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হতেই পারে কিন্তু উর্বর প্রকৃতিই যে প্রাণবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রধান জোগানদার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার এটাও নিশ্চিত যে, একমাত্র প্রাণই সৌরশক্তির জৈববন্ধন ঘটিয়ে প্রকৃতিতে তার প্রবাহ বজায় রাখে ও জৈবচক্রের মাধ্যমে প্রকৃতির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। প্রকৃতির উর্বরতার সঙ্গে প্রাণের এবং প্রাণের সঙ্গে উর্বরতার এ যেন এক পরিপূরক আত্মিক সম্পর্ক। প্রাণের রসদে পরিপূর্ণ সমভূমির উর্বর প্রকৃতিতে শুধুই যে মানুষের সংখ্যা বেশি তা নয়; গাছপালা, জীবজন্তু, অণুজীব এরা সবাই এখানে ভিড় জমিয়ে তৈরি করেছে প্রাণের এক মহামেলা। অন্যদিকে ধু-ধু মরুপ্রান্তরে কিংবা মালভূমির পাথুরে রুক্ষভূমিতে প্রাণের রসদের বড়ই অভাব। প্রকৃতির এই কৃপণতা এখানে জীবনের প্রবাহকে সঙ্কুচিত করেছে। শুধু মানুষ নয়, গাছপালা, জীবজন্তু এমন কি মাটিতে বসবাসকারী জীব ও অণুজীবের সংখ্যাও এখানে সীমিত। প্রকৃতির উর্বরতা হল মানুষের কাছে বিরাট আশীর্বাদ। জাগতিক নিয়মে একে মাপতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। জাগতিক নিয়মে কোনো বস্তুর আহরণ হতে থাকলে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময় নিঃশেষিত হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করে প্রাণের প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। যেখানে যত বেশি প্রাণের প্রবাহ, সেখানে তত বেশি রসদের ক্ষয়। সেই হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় উর্বর অঞ্চলের রসদ আজ নিঃশেষিত হয়ে প্রাণহীন হয়ে যাওয়ার কথা, তা কিন্তু হয় নি। বরং প্রাণের প্রবাহ যত বেশি হয়েছে, বেড়ে গেছে তার উর্বরতা। এইভাবে প্রাণহীন প্রান্তরেও ঘটেছে প্রাণের উন্মেষ এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর অঞ্চল হয়ে উঠেছে আরো প্রাণময়, আরও উর্বর। 'জীবনই জীবনকে সমৃদ্ধ করে আর জীবনহীনতাই জড়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করে'। **উমা**

জনৈক জনপ্রতিনিধি বল ও শপিং মল

বিবর্তন ভট্টাচার্য

ঘটনাঙ্ক গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৫ জনৈক জনপ্রতিনিধি তাঁর নাতিকে নিয়ে কলকাতার এক শপিং মলে কিছু কেনাকাটা করবার জন্য যান। হঠাৎ বলের শোরুমে তাঁর দেড় বছরের নাতির দুটি বল পছন্দ হয়। শিশুটি বল দুটো হাতে তুলে নিয়ে দাদুকে জানায়, ঐ দুটো বল তার পছন্দ। ঠিক সেই সময় দুজন শপিং মল কর্মী শিশুটির হাত থেকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বল দুটো কেড়ে নেয়। তখন বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করে। এরপরই ঐ শপিং মলের আধিকারিকদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির বাদানুবাদ শুরু হয়। শপিং মল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ঐ বলগুলো শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য। জনপ্রতিনিধি তাঁর পরিচয় দিয়ে বল দুটো কেনার জন্য জেদ ধরেন। এরপর তিনি পুলিসকে বলেন, একটা শিশুর হাত থেকে যেভাবে বলটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেটা অন্যায়।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ঐ শিশুটি সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের কোনো কৃষকের নাতি নয়। তাই শপিংমলের আধিকারিকগণ ব্যবসায়িক স্বার্থে যে কাজ করেছেন তা অমানবিক হলেও, এই ভয়ঙ্কর সংস্কৃতির জনক কিন্তু ঐ জনপ্রতিনিধিরাই। উনি বহু শপিং মল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল, তখন ঐ মলের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হন। কিন্তু বহুজাতিকের হাত ধরে ঐ শপিং মলেরা কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে তার উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ হয়ত ওটা। একচেটিয়া আগ্রাসনকে সমর্থন করব, বহুজাতিকদের কার্পেট বিছিয়ে আপ্যায়ন জানাব আর শপিংমলের শক্ত আচরণ পছন্দ করব না, তা হতে পারে না। একটু পিছিয়ে এসে আপনি ভাবুন তো, এটা যদি শ্রীরামপুরের কালো অথবা ভুলোর দোকানে হত, আপনি কি এই মানসিক কষ্টটা পেতেন অথবা ঐ শিশুটিকে অন্তত এইভাবে মানসিক কষ্ট পেতে হত না। কেন না ও ব্যবসা করলেও ও আপনার প্রতিবেশী।

শপিংমলের ইতিহাস অত্যন্ত অন্ধকারের। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ এই দশ বছরে ভেনেজুয়েলা ও আর্জেন্টিনার ইতিহাস ঘাঁটুন, তাহলেই আর ওয়ালমার্ট, ম্যাকডোনেল অথবা প্যান্টালুন কিংবা রিলায়েন্সকে ডাকবেন না। গত কয়েক বছর আগে দক্ষিণ কলকাতায় একটি বড় শপিং মলের উদ্বোধন হচ্ছিল তখন প্রয়াত কবি নবারুণ ভট্টাচার্য ঐ শপিং মলের সামনের ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে শপিং মলের কিছু নিরাপত্তা কর্মী ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। নবারুণবাবু আহত হন। তখন তাঁর দুর্বল আবেদন ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের ফুটপাথটাও ওরা কিনে নিয়েছে নাকি?

চারদিকে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে কত আলোচনা, কত মূর্তি স্থাপন! আর ওদিকে তাঁর সাধের বেঙ্গল কেমিক্যালের রেক্টিফায়েড স্পিরিট তৈরির কারখানা দখল করে তৈরি হয়েছে মণি শপিং মল। বিভিন্ন জলাভূমি বুজিয়ে এবং বহু দুর্নীতিগ্রস্ত ভয়ঙ্কর বহুজাতিকদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রয়াস এই শপিং মল। তাই এই আক্রমণের পর শিক্ষা নিন। লুট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক। একবার ভালো করে তাকান সিঙ্গুর, হরিপুর আর নন্দীগ্রামের দিকে, তবেই সম্মানিত হবে আপনার নাতি-নাতনিরা।

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা

পুস্তক পর্যালোচনা

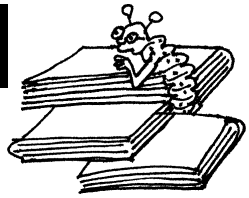

পরিবেশ নিয়ে জরুরি কাজ

যখন পৃথিবী বিপন্ন (সঙ্কলনগুচ্ছ পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ) প্রকাশকগুচ্ছ বিজ্ঞান অন্বেষক, কাঁচরাপাড়া। দামগুচ্ছ ৬০ টাকা। যোগাযোগগুচ্ছ ৯৪৭৪৩ ৩০০৯২। ই-মেলগুচ্ছ bijnandarbar1980@gmail.com

ভূতের গল্পে বা সিনেমায় 'ওই এলো রে, ওই এলো রে' আবহ তৈরিতে যে যত বেশি জম্পেশ করে করতে পারবে সে তত বড় গল্প বলিয়ে বা সিনেমা করিয়ে। সাসপেন্স জিইয়ে রাখাটাই হল গিয়ে মোদ্দা কথা। ভূতের রহস্যর পর্দা সরে গেলেই বই শেষ, সিনেমার পর্দা নেমে যায়। আলোচ্য বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে ভয় যেন চেপে ধরে, তবে এ ভয় সে ভয় নয়। এ তো আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দুরুদুরু বুকে চেপে ধরে অসহায় প্রতীক্ষা। অসহায় নয়ত কি! এত কথা, লেখা, আন্দোলন, বিজ্ঞানী ও পরিবেশ কর্মীদের সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে কে সেই। সবাই ভাবছে, সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে, ওসব সতর্কবাণীফানি কিছু নয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন, জঙ্গল কেটে ফেলা, মাটির তলার জল তোলা, কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, বায়ুদূষণ -- এরকম সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সামলাতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য এমনটা ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ বইয়ের প্রবন্ধগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্যে ঠাসা (একটু পুরনো হলেও)। চারদিকে এসব নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে। তবে কেন এই আগ্রাসী মনোভাব! কবে আমরা শিখব যে, নিজেদের ধ্বংস করার এই আত্মঘাতী মনোভাব না পাল্টালে কারো নিস্তার নেই। বিজ্ঞান দরবার একটি বেশ পুরনো গণবিজ্ঞান সংগঠন। হাটে, মাঠে, ঘাটে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে এরা মানুষকে আসন্ন বিপদগুলি নিয়ে সচেতন করছে। তাতে কিছু মানুষ তো বুঝছে, জানছে, তাই বা কম কি! বিজ্ঞান দরবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটা করেছে এ বইখানি ছেপে। তাও খটকা থেকেই যায় (১) আমাদের কথায় লেখা হল 'কিন্তু আমরা মানুষ— অমৃতের সন্তান'— যা খুশি বললেই হল! (২) দশ ক্লাসের ছাত্র নান্টু কাকুর সঙ্গে তর্কে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬' টেনে আনছে— একটু বাড়াবাড়ি হল না? (৩) বন্যার জলসংরক্ষণের দাওয়াই 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া বাড়িয়ে জলাধার নির্মাণ করার' সমাধানসূত্র কি বাস্তুবিজ্ঞান সম্মত? দ্রষ্টব্য 'জল যখন জীবনরেখা'।

বরুণ ভট্টাচার্য

আতস কাচের তলায় ঈশ্বর ও কুসংস্কার

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তুমি কোথায়? হরিপ্রসন্ন পাল, প্রকাশক গুচ্ছ লেখক, মূল্য গুচ্ছ ৯০ টাকা

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, বই-এর প্রাপ্তিস্থান নিয়ে কোনো কথা বলা নেই। কাজেই (সন্ধানী?) হরিপ্রসন্ন পালের বইটি সাধারণের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা থেকে যাচ্ছে। লেখক মলাটের ভিতরে এবং প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি আটকে দিয়ে বইটির সৌন্দর্য বেশ খানিকটা কমিয়ে দিয়েছেন। আর সন্ধানী উপাধিটা কি স্বোপার্জিত?

বইটিতে উনিশটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন গুচ্ছ বিজ্ঞানের চোখে ভূত-প্রেত দর্শন, ভাগ্যের নিয়ন্তা ভগবান? লৌকিক ও অলৌকিক ধারণার উৎপত্তি ও কারণ, লোককথাগুচ্ছ লোকবিশ্বাস, ইত্যাদি। বিষয়গুচ্ছ আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তথাকথিত অলৌকিক তথা অতিপ্রাকৃতিক তথা অতিদৈবিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণের চেষ্টা। এ বিষয়গুলি বহুচর্চিত। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন এর বিরুদ্ধে হাতেকলমে প্রচার চালাচ্ছে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে। 'উৎস মানুষ'ও এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়। প্রবন্ধগুলো মোটামুটি সুখপাঠ্য হলেও কুসংস্কারের থেকে বেরিয়ে আসার কোনো আপাত সমাধান পাওয়া যায় না।

তবে, বইটি কোনো শিক্ষিত মানুষের হাতে এলে, চিন্তার খোরাক একটু হলেও জোগাবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত।

আলোচনায় শিক্ষা ও শিক্ষানীতি

শিক্ষার ভাবনাঃ ভাবনার শিক্ষা বঙ্গীয় শিক্ষার হালচাল, ইমনকল্যাণ জানা, কানন প্রকাশনী, মূল্যঃ ২০০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচিত ১৮টি প্রবন্ধ এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার বর্তমানের বিভিন্ন দিক, যেমন, পশ্চিমবঙ্গের নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা ও কিছু আলোচনা, বাংলা ভাষাভাষী বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সঙ্কট, রবীন্দ্রনাথ, আরাবুলঃ কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন– এইসব নিয়ে ইমনকল্যাণ আলোচনা করেছেন। ভাষা সহজবোধ্য, সাবলীল। দীর্ঘ এই প্রবন্ধগুলো লিখতে তিনি বেশ পরিশ্রম করেছেন। প্রধানত মাধ্যমিক শিক্ষার আঙ্গিনায় সরকারের নেওয়া বিভিন্ন নিয়মনীতি কীভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে/করেছে সেই নিয়েই আলোচনা। এই আলোচনাগুলির যুক্তি সাজাতে তিনি কোনো ক্ষেত্রে স্ট্যাটিসটিক্সের সাহায্য নিয়েছেন।

স্ট্যাটিসটিক্স প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে। প্রথম প্রবন্ধে ইমনকল্যাণ আটটা (চারটে?) বিদ্যালয় নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন। এত অল্প বিদ্যালয় নিয়ে সমীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে গণনায় ভুল অনেক বেশি হয়। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ থাকলে ভাল হত। আর সহযোগী গ্রন্থের একটা তালিকা থাকা প্রয়োজন ছিল বই কি!

রামকৃষ্ণ আলোচনায় চিন্তার খোরাক জোগাবে

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু অজানা প্রসঙ্গ, সুনীত দে, দে পাবলিশিং, মূল্য ১৫০.০০

২২টি অধ্যায়ে লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বইটি এক অন্য ধরনের বই। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, সেবাইত হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়োগ-- এইসব নিয়ে এক গবেষণামূলক লেখা লিখেছেন সুনীত দে। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তৈরির পেছনে যে রাজনীতি ছিল, তা তিনি বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। যেমন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও জাতপাত' অধ্যায়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন এবং ধনী কামারনীকে ভিক্ষা মা হিসাবে গ্রহণ। পরে রামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছেন, 'আমার কামার বাড়ির দাল খেতে ইচ্ছে ছিল; ছেলেবেলা থেকে কামাররা বলতো বামুনরা কি রাঁধতে জানে? তাই (ধনীর বাড়ি) খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ'। (সকলের হাস্য)। (কথামৃত - শ্রীম, দ্বিতীয় ভাগ, একাদশ সংস্করণ -১৩৮৮, পৃ. ১৩২)। স্বাভাবিক প্রশ্ন তিনি করেছেন, কোন সময়টাকে ধরা হবে শৈশবের 'ভিক্ষা মা' নাকি প্রাপ্ত বয়সের 'কামারে কামারে গন্ধ'। এইরকম বিভিন্ন ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন। বইটা সুখপাঠ্য এবং নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়